রবীন্দ্রচিন্তায় নারী

সিরাজুল ইসলাম*

'ছোটোবেলায় মেয়েদের স্নেহযত্ন মানুষ না যাচিয়াই পাইয়া থাকে। আলো-বাতাস তাহার যেমন দরকার এই মেয়েদের আদরও তাহার পক্ষে তেমনি আবশ্যক।'[১] শৈশবে নারীর ভূমিকা সম্পর্কে রবীন্দ্রচিন্তার এই ধরন বিশেষ কোনো তত্ত্বাশ্রিত নয় — মানবিক, প্রয়োজনীয় ও ব্যবহারিক। সম্পূর্ণ রবীন্দ্রসাহিত্যেই নারীর অস্তিত্ববিবেচনা ও নারীমুক্তির প্রসঙ্গটি স্বাভাবিক, সমাজসাপেক্ষ ও প্রাকৃতিক; বিশেষ কোনো একাগ্র অভিনিবেশ নয়। তবু সংবেদনশীল হৃদয়ে তিনি ধারণ করেছিলেন পরিবার-সমাজ-রাষ্ট্র, সর্বোপরি ব্যক্তিজীবনে নারীর ভূমিকা ও অবস্থানের গুরুত্ব। এ-ক্ষেত্রে জীবনপথের সৃষ্টিশীল এ-যাত্রী উচ্চকণ্ঠ সামাজিক ডঙ্কা বাজাতে পারেননি সত্য, আবার সামাজিক চাপও অস্বীকার করেননি। উনিশ শতকীয় সংস্কার আন্দোলনের প্রায় পুরোটাই মানবীয় মুক্তির ধারাক্রমে নরনারীর সম্পর্ক নিয়ে। উনিশ শতকে সতীদাহ রহিতকরণ (১৮২৯), বিধবাবিবাহ প্রচলন (১৮৫৬), হিন্দুত্ব বর্জন করে অসবর্ণ বিবাহ (১৮৭২) এবং বিশ শতকে হিন্দুত্ব বর্জন না-করে অসবর্ণ বিবাহ (১৯২৩), বাল্যবিবাহ রহিতকরণ (১৯২৯) প্রভৃতি সামাজিক আন্দোলন, লিখিত বিতর্ক ও আইন প্রবর্তন নিশ্চিতভাবেই রবীন্দ্র-মনোগঠনে আলোড়ন তৈরি করেছে। আমরা বর্তমান আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ যেখানে সচেতনভাবে ধৃত, সেই প্রবন্ধাবলিতে নারী-বিবেচনার প্রসঙ্গগুলো অনুধাবনের চেষ্টা করব।

নবজাগরণ বা সংস্কার-আন্দোলন দ্বারা প্রভাবিত রবীন্দ্রনাথ নবযৌবনের স্বভাবগুণেই সম্ভবত নারীর স্বপক্ষে লেখনী ধারণে ছিলেন উত্তেজিত। ১২৮৫ সালের আশ্বিন মাসে ইংল্যান্ড যাত্রা এবং ইংল্যান্ড থেকে সেখানকার সমাজ ও মাঝে মাঝে ভারতীয় সমাজের যে তুলনামূলক আলোচনাসমৃদ্ধ পত্রসূচনা করেন তা 'ভারতী' পত্রিকায় বৈশাখ ১২৮৬ থেকে শ্রাবণ ১২৮৭ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। 'য়ুরোপ-যাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্র' শিরোনামে এই পত্রগুলো পত্রিকার সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর যথেচ্ছ টীকাভাষ্য-মন্তব্যসহ ছাপিয়েছেন, যা বাঙালির সমাজমনস্তত্ত্বকে স্বীকার করে। প্রথম প্রকাশের কালে *য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র* (১২৮৮) এই টীকাভাষ্যসহই ছাপা হয়েছিল। এর কোনো দ্বিতীয় প্রকাশ ঘটেনি, সম্ভবত এই তর্ক-বিতর্কে রবীন্দ্রনাথের মন ওঠেনি; বহুকাল পরে *য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি*-র সঙ্গে একত্রে একটি পরিবর্তিত সংস্করণ *পাশ্চাত্য ভ্রমণ* (আশ্বিন ১৩৪৩) প্রকাশিত হয়; সেখানে প্রথম সংস্করণের ষষ্ঠ পত্রের অংশ, সপ্তম ও দশম পত্র, এবং তৎসহ ভারতী-সম্পাদকের মন্তব্যগুলো পরিত্যক্ত হয়েছে। কী ছিল সেই পত্রগুলোতে? সমকালীন সমাজমনস্তত্ত্বকে, বদ্ধ এক নীতিনিয়ন্ত্রিত পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতাকে উত্তেজিত করতে পারে এমনই আকর্ষণীয় উক্তি ছিল সেগুলোতে। এই ব্যাপারগুলো তিনি অনুধাবন করেছিলেন ইয়োরোপীয় সমাজের

---

* অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সঙ্গে ভারতীয় সমাজের তুলনামূলক বিচারে। *য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র* গ্রন্থের ষষ্ঠ পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন নারীর অবরুদ্ধতা সম্পর্কে :

> একদল বুদ্ধিমান বিবেচনা বিশিষ্ট জীবকে কত শতাব্দী হতে নির্দয় লোকাচারের শাসন পীড়ন দমন বন্ধন করে পোষা জন্তুর চেয়ে নির্জীব বশীভূত সংকুচিত সংকীর্ণমন করে তোলা হয়েছে, সে একবার ভালো করে কল্পনা করে দেখতে গেলে সর্বাঙ্গ শিউরে ওঠে। ... এ সকল যদি পাপ না হয় তবে নরহত্যাও পাপ নয়।[২]

এই বক্তব্য রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সামাজিক আন্দোলনে সংস্কৃত সমাজমনে গ্রাহ্য হয়নি। সমাজ যে বেশিদূর এগোয়নি তারই দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা যায় রবীন্দ্রনাথের এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মন্তব্য :

> অন্তঃপুরে থাকা স্ত্রীজনের পক্ষে সুবিধাজনক বলিয়াই স্ত্রীলোকের অন্তঃপুরবাস প্রথা প্রচলিত হইয়াছে, পুরুষেরা স্বার্থপর বলিয়া ওরূপ প্রথা প্রচলিত হইয়াছে, এ কথা কোনো কার্যের কথা নহে।[৩]

আঘাত যে যথাযথ ও মর্মভেদী তা নিঃসন্দেহ। রবীন্দ্রনাথও পরবর্তী পত্রে নারীস্বাধীনতা সম্পর্কে নিজের অভিমত ও দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বক্তব্যের পাল্টা বক্তব্য উপস্থাপন করেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত সমাজকর্তৃত্বই জয়ী হয়, পরিবর্তিত *য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র* একখানি ইয়োরোপীয় সমাজ-সমালোচনার গ্রন্থের রূপ পায়, হারিয়ে যায় রবীন্দ্রনাথের যৌবনের সেই শুভবোধের লিখিত রূপ। তিনি এখানে কেবল ইয়োরোপীয় নারীদের চোখে নিজেকে ঠাট্টা করেছেন,[৪] তাদের বিবেচনা করেছেন দেহের মায়াজাল মোহবিস্তারকারিণী হিসেবে,[৫] ভারতীয় নারীদের সঙ্গে ইতালীয় নারীর সৌন্দর্যের ঐক্য খুঁজেছেন।[৬] ইংল্যান্ডে নরনারীদের দৈনন্দিন কার্যকলাপ উপস্থাপনে রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছেন শ্লেষমিশ্রিত ভঙ্গি :

> মেয়েরা বেশভূষায় লিপ্ত, পুরুষেরা কাজকর্ম করছে, সংসার যেমন চলে থাকে তেমনি চলছে, কেবল রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে বিশেষভাবে কোলাহল শোনা যায়। মেয়েরা জিজ্ঞেস করে থাকে, তুমি নাচে গিয়েছিলে কি না, কনসর্ট কেমন লাগল, থিয়েটারে একজন নূতন অ্যাকটর এসেছে, কাল অমুক জায়গায় ব্যান্ড হবে ইত্যাদি। ... এ দেশের মেয়েরা পিয়ানো বাজায়, গান গায়, আগুনের ধারে আগুন পোয়ায়, সোফায় ঠেসান দিয়ে নভেল পড়ে, ভিজিটরদের সঙ্গে আলাপচারি করে ও আবশ্যক বা অনাবশ্যক মতে যুবকের সঙ্গে ফ্লার্ট করে। এ দেশের চির-আইবুড়ো মেয়েরা কাজের লোক। টেম্পারেন্স মিটিং, ওয়ার্কিং মেন্‌স্ সোসাইটি প্রভৃতি যতপ্রকার অনুষ্ঠানের কোলাহল আছে, সমুদয়ের মধ্যে তাদের কণ্ঠ আছে। পুরুষের মতো তাদের আপিসে যেতে হয় না, মেয়েদের মতো ছেলেপুলে মানুষ করতে হয় না, এ দিকে হয়তো এত বয়স হয়েছে যে 'বলে' গিয়ে নাচা বা ফ্লার্ট করে সময় কাটানো সংগত হয় না, তাই তাঁরা অনেক কাজ করতে পারেন, তাতে উপকারও হয়তো আছে।[৭]

রবীন্দ্রনাথ প্রথাগত ফ্যাশানেবল নারীদের বিরুদ্ধে ছিলেন খড়্গহস্ত; তারা যে কর্মহীন, বিলাসী ও ভাসমান এই নিয়ে তিনি বিদ্রূপাত্মক, আক্রমণকারী।[৮] তারা ভালোবাসার অভিনয়, মিষ্টি হাসি, অলীক ছুতো-মান-অভিমান-রসিকতা নিয়ে ব্যস্ত থাকে; ভিজিট ও ভিজিট-প্রত্যর্পণ, ফ্যাশন ও ফ্লার্ট করেই তাদের দিন কাটে; তারা চাকরির জন্য নয়, বিয়ের

বাজারদরে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় লেখাপড়া করে আর নভেল পড়ে।[৯] বিলাসী ফ্যাশনেবল মেয়েদের বাইরেও কর্মী নারীদের অবস্থান ছিল। মধ্যবিত্ত সংসারের নারীদের যথেষ্ট পরিশ্রম করতে দেখেছেন রবীন্দ্রনাথ। তারা রান্নাঘর ও বাজারের হিসাব নিয়েই ব্যস্ত থাকে; তাদের নভেল পড়বার অবসর হয় না বা মনে থাকে না। তারা পলিটিক্স নিয়েও মাথা ঘামায় না, তার ভার পুরুষের। এই প্রবণতাকে রবীন্দ্রনাথ মেয়েদের দুর্বলতা হিসেবে ভেবেছেন; "দুর্বলতা মেয়েদের একটা গর্বের বিষয়; সুতরাং অনেক মেয়ে শ্রান্ত না হয়েও এলিয়ে পড়েন। বুদ্ধিবিদ্যার বিষয়েও এইরকম; মেয়েরা জাঁক করে বলেন, 'আমরা বাপু ও-সব বুঝিসুঝি নে।" সেখানে মধ্যবিত্ত মেয়েরা বিশেষ লেখাপড়া শেখে না, স্বামীদেরও এ নিয়ে কোনো দুঃখ নেই। তারা গার্হস্থ্য সাদাসিধে জীবনযাপনে অভ্যস্ত। তবে এসব মেয়ে বাইরের জীবনে হতচকিত থাকে না, তারা ভালোই মেলামেশা করতে পারে; বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে সহজেই মিশে। এই প্রবণতাটিরই অভাব ছিল ভারতবর্ষে। এসব নারী সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য ইতিবাচক এবং সম্ভবত নিজ সমাজে এর অপূর্ণতা নিয়ে ছিলেন তিনি সচেতন। পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাপেক্ষে নারীর সামাজিক উপযোগিতার প্রসঙ্গই যেন উচ্চারিত হয় এখানে :

> বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে খুব সহজভাবে গল্পসল্প করতে পারেন, নিমন্ত্রণসভায় মুখ ভার করে বা লজ্জায় অবসন্ন হয়ে থাকেন না, পরিচিতদের সঙ্গে অন্যায় ঘেঁষাঘেঁষি নেই, কিংবা তাদের কাছ থেকে নিতান্ত অসামাজিক ভাবে দূরেও থাকেন না। লোকসমাজে মুখটি খুব হাসিখুসি, প্রসন্ন; যদিও নিজে খুব রসিকা নন, কিন্তু হাসিতামাশা বেশ উপভোগ করতে পারেন, একটা কিছু ভালো-লাগলে মন খুলে প্রশংসা করেন, একটা-কিছু মজার কথা শুনলে প্রাণ খুলে হাস্য করেন।[১০]

য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র গ্রন্থের যমজরূপ হিসেবে প্রকাশিত হয় *য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি* (১২৯৮)। এটিও কেবল ইয়োরোপ-দর্শনে সীমাবদ্ধ, বিশেষভাবে ইয়োরোপ-সমালোচনাই এতে প্রকাশিত। এই গ্রন্থে ঘটনাক্রমে একস্থানে নারীর অসংযম দেহ-প্রকাশকে রবীন্দ্রনাথ কেবল সংস্কারবশত নয়, অপ্রয়োজনীয় বলেই গ্রহণ করতে পারেননি। বিলাত যাত্রায় স্টিমারে লেডিদের অতিরিক্ত দেহপ্রদর্শনের ব্যাপারটিতে রবীন্দ্রনাথ একেবারে চোখবন্ধ-করা ছিলেন না; জানিয়েছেন 'একটি যুবতী আপনার যৌবনশ্রী বহুলপরিমাণে উদঘাটিত করে দিয়ে সহাস্যমুখে আহার এবং আলাপে নিযুক্ত।' বিশেষত সেই যুবতীর 'শুভ্র সুগোল সুচিক্কণ গ্রীবাবক্ষবাহু' প্রতিসারিত 'অনাবৃত আলোকশিখা' সহজেই অন্য পুরুষদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথেরও দৃষ্টিগ্রাহ্য হচ্ছিল। এই পোষাক নিয়ে সকল পুরুষই আলোচনায় মেতে উঠেছিল, রবীন্দ্রনাথই কেবল 'বেআব্রু বেআদবিটা' বুঝতে পারেননি। এর সঙ্গে তুলনা করে রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষে বাসরঘরের উৎসবে 'মেয়েরা যেমন অবাধে লজ্জাহীনতা প্রকাশ করে' তার উল্লেখ করেছেন। তবে শেষপর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ ইয়োরোপীয় নারীর সৌন্দর্যের বিশেষ সুখ্যাতি তুলে ধরেছেন। এর মধ্যে দেখতে পাওয়ার আনন্দ আছে, যেই সুযোগ তিনি বাঙালি সমাজে পাননি : 'এখানে রাস্তায় বেরিয়ে সুখ আছে। সুন্দর মুখ চোখে পড়বেই। শ্রীযুক্ত দেশানুরাগ যদি পারেন আমাকে ক্ষমা করবেন। নবনীর মতো সুকোমল

শুভ্র রঙের উপরে একখানি পাতলা টুকটুকে ঠোঁট, সুগঠিত নাসিকা এবং দীর্ঘপল্লববিশিষ্ট নির্মল নীলনেত্র — দেখে প্রবাসদুঃখ দূর হয়ে যায়।'[১১] এরই ধারাবাহিকতায় রবীন্দ্রনাথ কারোলু ডুঁরা নামক একজন ফরাসি চিত্রকরের চিত্রে নারীর নগ্ন সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হন। ভারতীয় দেহ-সংস্কার ত্যাগ করেই এই লেখা রবীন্দ্রনাথের, এতে তাঁর নারী মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে অবহিত হওয়া সম্ভব :

> আমরা প্রকৃতির সব শোভাই দেখি, কিন্তু মর্ত্যের এই চরম সৌন্দর্যের উপর, জীব-অভিব্যক্তির এই সর্বশেষ কীর্তিখানির উপর, মানুষ স্বহস্তে একটি চির-অন্তরাল টেনে রেখে দিয়েছে। এই দেহখানির স্নিগ্ধ শুভ্র কোমলতা এবং প্রত্যেক সুঠাম সুনিপুণ ভঙ্গিমার উপরে অসীম সুন্দরের সযত্ন অঙ্গুলির সদ্যস্পর্শ দেখা যায় যেন। এ কেবলমাত্র দেহের সৌন্দর্য নয়, যদিও দেহের সৌন্দর্য যে বড়ো সামান্য এবং সাধুজনের উপেক্ষণীয় তা বলতে পারি নে — কিন্তু এতে আরো অনেকখানি গভীরতা আছে। একটি প্রীতি-রমণীয় সুকোমল নারী-প্রকৃতি, একটি অমরসুন্দর মানবাত্মা এর মধ্যে বাস করে, তারই দিব্য লাবণ্য এর সর্বত্র উদ্‌ভাসিত। দূর থেকে চকিতের মতো সেই অনির্বচনীয় চির-রহস্যকে দেহের স্ফটিক-বাতায়নে একটুখানি যেন দেখা গেল।[১২]

নারীকে বিশেষ প্রকৃতি হিসেবে গ্রহণ করার প্রবণতা এই বক্তব্যে লক্ষণীয়। দৃশ্যের অতিরেক সত্যের সন্ধানে যাত্রা রবীন্দ্রসুলভ অভিজ্ঞতা, নারীসত্তার অবলোকনেও সেই ব্যাপারটি ঘটেছে। এ যেন এক আধ্যাত্মিক দর্শন।

রবীন্দ্রনাথ ইয়োরোপীয় সমাজে নারীর স্বাধীনতা, স্বয়ংপ্রকাশ ও অধিকারবোধকে অনুধাবন করেছেন সচেতনভাবেই। নারীপুরুষের সম্পর্কের মধ্যে মমত্ব ও সৌহার্দ্যকে তিনি বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন; যেহেতু পুরুষ শারীরিক ও সামাজিকভাবে বলশালী বা কর্তৃত্ববান সেহেতু নারীর প্রতি পুরুষের দায়িত্বও অধিক। ভারতবর্ষের পুরুষের প্রতি লক্ষ করেই লিখেছেন :

> যে দেশের পুরুষেরা কাপুরুষ তারাই নির্লজ্জভাবে পুরুষ-পূজাকে, পুরুষের প্রাণপণ সেবাকেই, স্ত্রীলোকের সর্বোচ্চ ধর্ম বলে প্রচার করে; সেই দেশেই দেখা যায় স্বামী রিক্তহস্তে আগে আগে যাচ্ছে আর স্ত্রী বোঝাটি বহন করে পিছনে চলেছে, স্বামীর দল ফার্স্টক্লাসে চড়ে যাত্রা করছে আর কতকগুলি জড়োসড়ো ঘোমটাচ্ছন্ন স্ত্রীগণকে নিম্নশ্রেণীতে পুরে দেওয়া হয়েছে, উচ্ছিষ্ট ও উদ্‌বৃত্ত কেবল স্ত্রীলোকের, তাই বেহায়া কাপুরুষেরা অসংকোচে গৌরব করে থাকে এবং তার তিলমাত্র ব্যত্যয় হলে সেটাকে তারা খুব একটা প্রহসনের বিষয় বলে জ্ঞান করে। ... স্বার্থপরতা পৃথিবীর সর্বত্রই আছে কিন্তু নির্লজ্জ নিঃসঙ্কোচ স্বার্থপরতা কেবল সেই দেশেই আছে যে দেশে পুরুষেরা ষোলো-আনা পুরুষ নয়।[১৩]

পুরুষতান্ত্রিক নির্বোধ আধিপত্যের প্রতি আঘাত এখানে স্পষ্ট। তাঁর মতে, পুরুষেরা নারীর থেকে যে সেবা পায় তারও সেই সেবার প্রত্যুত্তর করা উচিত। সেবার বিনিময়ে সেবাই নারীকে মমত্ব, অধিকার বা সেবা প্রদর্শনের উপায় : '... যে দেশে স্ত্রীলোকেরা সেই সেবা পায় না, কেবল সেবা করে, সে দেশে তারা অপমানিত এবং সে দেশও লক্ষ্মীছাড়া।'

রবীন্দ্রনাথ পরিবারে নারী-অস্তিত্বের এমন এক পরিসর চেয়েছেন যেখানে সে স্বস্তি বোধ করবে, পাবে অধিকার। সমাজের ক্ষুদ্রতম একক হিসেবে পরিবার যদি নারীকে মমত্ব না দেখায়

সে নিরস্তিত্বের শঙ্কায় পড়বে। কেবল প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্কে মানবিক পরিচয় বা মহত্ত্ব সৃষ্ট হয় না, তৈরি হয় হীনমান পরিস্থিতি ও বিশ্লিষ্টতা। কোনো বিধান বা ধর্মীয় নৈতিকতাই এই ক্ষয় ও বিচ্ছিন্নতার অবসান ঘটাতে পারে না। এজন্য রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেন নারীর অস্তিত্বের সংকটময় প্রসঙ্গ ও মীমাংসার তাড়না : 'আমাদের পরিবারের মূল ভাবটা কী? না, শাসনকারী ও শাসিতের সম্পর্ক, প্রভু ও অধীনের সম্পর্ক, গুরু ও কনিষ্ঠের সম্পর্ক। আর কোনো সম্পর্ক নাই। ... এমন-কি, স্বামীর প্রতিও ভক্তি করা আমাদের শাস্ত্রের বিধান। স্বামীর আদেশ পালন করা পুণ্য। সেই সুগৃহিণী যাহার পতিভক্তি আছে! যাহার প্রতি স্বতই ভালোবাসা ধাবিত হয় এমন যে স্বামী, তাহার কথা শুনিবার জন্য কি ভক্তির আবশ্যক করে? ... লোক মুখে শুনা গিয়াছে অনেক স্ত্রী প্রাতঃকালে উঠিয়া স্বামীর পদধূলি গ্রহণ করে! এমন হাস্যজনক কৃত্রিম অভিনয় তো আর দুটি নাই!'[১৪] দাসত্বে মুক্তি নেই, এক্ষেত্রে প্রেমের প্রসঙ্গই আসে না। প্রেম স্বতই প্রেমাস্পদকে আত্মস্থ করে ও মুক্তি দেয়, নৈতিকতার দায় এখানে অবান্তর বলেই মনে করেন রবীন্দ্রনাথ। নৈতিকতা যে বাধ্যবাধকতা তৈরি করে তা যান্ত্রিক বলেই মানবিক সম্পর্কে খাপ-খায় না। প্রেমের স্বয়ংসম্পূর্ণতার প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথ নরনারীর একাত্মতার ধারণায় বিশ্বাসী, সেখানে বিভেদ থাকতেই পারে না। স্ত্রৈণ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ নতুন ব্যাখ্যা দাঁড় করবার চেষ্টা করেছেন, এর দ্বারা ভারতবাসীর সঙ্গে ইংরেজের নারী সম্পর্কিত মতাদর্শের পার্থক্যও নিরূপিত হচ্ছে :

> যে ব্যক্তি স্ত্রীকে কিছু বিশেষরূপে ভালোবাসে সাধারণত লোকে তাহাকেই স্ত্রৈণ বলে। কিন্তু বাস্তবিক স্ত্রৈণ কে? না, যে ব্যক্তি স্ত্রীকে আশ্রয় দিতে পারে না, স্ত্রীর উপর নির্ভর করে। বলিষ্ঠ পুরুষ হইয়াও অবলা নারীকে ঠেসান দিয়া থাকে! যে ব্যক্তি পড়িয়া গেলে স্ত্রীকে ধরিয়া উঠে, মরিয়া গেলে স্ত্রীকে লইয়া মরে; যে ব্যক্তি সম্পদের সময় স্ত্রীকে পশ্চাতে রাখে ও বিপদের সময় স্ত্রীকে সম্মুখে ধরে ... সেই স্ত্রৈণ। ... ইংরাজ জাতিরা স্ত্রৈণের ঠিক বিপরীত।[১৫]

পরিবারে নরনারীর প্রেম ও দাম্পত্যে একীকরণের প্রসঙ্গ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ স্বভাবত অনুভব করেছিলেন সমকালীন সামাজিক চাপ। *সমালোচনা* (১২৯৪) গ্রন্থের 'সমস্যা' (ফাল্গুন ১২৯১) নামের প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ নারীর বাল্যবিবাহ, নারীশিক্ষা ও বিধবাদের সামাজিক বাস্তবতা সম্পর্কে উপস্থাপন করেছেন স্বীয় বক্তব্য। ইয়োরোপীয় সমাজ সম্পর্কে আলোচনার প্রতিতুলনায় এই প্রসঙ্গগুলো জটিলতার বিচারে গভীর ও বহুমুখী। তবু মানবিকবোধের উত্তেজনায় তিনি অগ্রসর হয়েছেন, এর পেছনে রেনেসাঁসের শুভদৃষ্টির প্রেরণা থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু উনিশ শতকের অন্তে এসে ততদিনে 'ভারতমাতা'র আত্মদর্শন সমাজে সাময়িক সময়ের পিছুটান তৈরিতে সচেষ্ট। এর ফলে যে-কোনো মীমাংসায় ভারত ও ইয়োরোপের যোগ-যন্ত্রণা এবং যুগযন্ত্রণা ঘটে যাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথও প্রথমে অমীমাংসার ধারাক্রমে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও পিছুটানে আক্রান্ত। বিধবাবিবাহ ও বাল্যবিবাহ সম্পর্কে তাঁর মত ছিল নিম্নরূপ :

> [ক] স্বামীর মৃত্যুর পরে পুনরায় বিবাহ করিলে পবিত্র দাম্পত্যধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করা হয়, এ বিষয়ে অনেকের সংশয় নাই। কিন্তু পৃথিবীর সুখ হইতে বিধবাদিগকে বঞ্চিত করা তাঁহারা নিষ্ঠুরতা জ্ঞান করেন। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলেই দেখা যায় বিধবাদিগকে পৃথিবীর সুখে মগ্ন করিয়া রাখাই প্রকৃত নিষ্ঠুরতা।[১৬]

> [খ] সকল অবস্থাতেই আইনপূর্বক বাল্যবিবাহ বন্ধ করিলে সমাজে দুর্নীতি প্রশ্রয় পাইতে পারে। অবস্থানির্বিচারে বিবাহার্থিনী বিধবা মাত্রেই বিবাহ দিতে গেলে অস্বাস্থ্যজনক উচ্ছৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। স্ত্রী মাত্রেরই স্বাধীনতা দিতে গেলেই বঙ্গীয় সমাজকে অপদস্থ হইতে হয়।[১৭]

দোলাচল ছিল কিন্তু যাত্রা সচল ছিল, পথও রুদ্ধ করেননি রবীন্দ্রনাথ। এর দ্বারা রবীন্দ্রচিন্তা থেকেছে গতিশীল, খুব সহজেই নতুন পথে তিনি অগ্রসর হতে পেরেছেন। ভারতীয় বিবাহের ধারণায় আদর্শ গুরুত্ব পায়, ব্যক্তি নয় — এই অভিযোগ করার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তির অস্তিত্বকে স্বয়ংক্রিয় ও আত্মনিষ্ঠ করতে চেয়েছেন। বিবাহ যে ব্যক্তির প্রয়োজন, কোনো আদর্শের জন্য নয়, এই দৃষ্টিভঙ্গি মেনে নিলেই বিধবা বিবাহে কোনো বাধা থাকে না। ভাবপূজার বিপরীতে ব্যক্তি-আদর্শ সমুন্নত রাখতে পারলেই দাম্পত্য যথার্থ রূপ পায়; *চিঠিপত্র* (পপ্র. ১২৯২; গ্রপ্র. ১২৯৪) গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

> ব্যক্তিবিশেষ উপলক্ষ মাত্র, স্বামীই প্রধান লক্ষ্য। এইজন্য ব্যক্তির ভালোমন্দের উপর ভক্তির তারতম্য হইত না। সকল স্ত্রীর সকল স্বামীই সমান পূজ্য। য়ুরোপীয় স্ত্রীর ভক্তি-প্রীতি ব্যক্তির মধ্যেই বদ্ধ, ভাবে গিয়ে পৌঁছায় না। এইজন্য স্বামী-নামক ব্যক্তিবিশেষের দোষগুণ-অনুসারে তাহার ভক্তি-প্রীতি নিয়মিত হয়। এইজন্যই সেখানে বিধবাবিবাহে দোষ নাই, কারণ সেখানকার স্ত্রীরা ভাবকে বিবাহ করে না, ব্যক্তিকেই বিবাহ করে, সুতরাং ব্যক্তিত্বের অবসানেই স্বামিত্বের অবসান হয়।[১৮]

রবীন্দ্রনাথের মনস্তত্ত্বে ভারতীয় বনাম ইয়োরোপীয় সমাজের প্রতিতুলনার ব্যাপারটি প্রথমাবধি বদ্ধমূল। তিনি একটি মুক্ত সমাজ আকাঙ্ক্ষা করেন, যাকে উদার মানবতাবতাবাদীও বলা যায়, তার আদর্শ পেয়েছেন ইয়োরোপের সান্নিধ্যে। এই বোধ থেকেই তিনি সমকালীন হিন্দু পরিবারকাঠামো, দাম্পত্যগঠন ও নারীর রুদ্ধ অবস্থান নিয়ে প্রতিবাদী। হিন্দুবিবাহের ধরন নিয়ে সমকালে যে বিতর্ক ছিল তাতে রবীন্দ্রনাথও অংশগ্রহণ করেছেন। তাঁর মতে, নারীপুরুষের সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক ও ধর্মনৈতিক অবস্থানের কারণেই বৈষম্য নিশ্চিত এবং এই বৈষম্যে দাম্পত্যে একীকরণ অসম্ভব। এই দাম্পত্যে নারী বাধ্যতামূলকভাবে পুরুষের নিম্নস্তরে সংসারযাপন করে। বিয়ের বয়স, সন্তান-উৎপাদন প্রভৃতি ক্ষেত্রে নারী কোনো বাস্তব সুবিধা লাভ করে না বিধায় দাম্পত্য শেষপর্যন্ত পুরুষ আধিপত্যের প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। কিন্তু সামাজিক পরিবর্তনের সাপেক্ষে নারীপুরুষ তার দাম্পত্যযাপনে ইয়োরোপীয় মতাদর্শে আগ্রহী হলে তাই হবে বাস্তব এবং রবীন্দ্রনাথ এ ক্ষেত্রে মতাদর্শিক একীকরণের পক্ষে। রবীন্দ্রনাথ জানাচ্ছেন :

> [ক] পুরুষ শাস্ত্রচর্চাবান এবং স্ত্রী শাস্ত্রচর্চাহীন মন্ত্রহীন হয়, ইংরেজি মতে ইহা প্রার্থনীয় নয়। বিবাহে স্ত্রীপুরুষের একীকরণ ইংরেজি বিবাহের উচ্চ আদর্শ। কিন্তু সে-একীকরণ সর্বাঙ্গীণ একীকরণ — কেবল সাংসারিক একীকরণ নহে, মানসিক একীকরণ।....
>
> যাঁহারা বলেন হিন্দু বিবাহের এইরূপ আদর্শ, তাঁহাদের কথা প্রমাণাভাবে এখনো মানিতে পারি না। হিন্দুবিবাহে মনে মনে, প্রাণে প্রাণে, আত্মায় আত্মায় মিল ঘটিয়া থাকে কি না বিচার্য। আমরা স্ত্রীকে সহধর্মিণী নাম দিয়া থাকি বটে, কিন্তু মনু স্পষ্টই বলিয়াছেন, স্ত্রীদের মন্ত্র নাই, ব্রত নাই, উপবাস নাই; কেবল স্বামীকে শুশ্রূষা করিয়া তাঁহারা স্বর্গে মহিমান্বিত হন। ইহাকে উচিতমতে স্বামীর সহিত সহধর্ম বলা যায় না।[১৯]

[খ] যদি আমরা সম্পূর্ণতা লাভের জন্য, আমার সমগ্র মানবপ্রকৃতির চরিতার্থতা-সাধনের জন্য আমি স্ত্রী চাই, তবে তাঁহাকে সন্ধান করিতে হইবে। সন্ধান করিলেই যে সকল সময়েই সম্পূর্ণ কৃতকার্য হওয়া যাইবে, এমন কোনো কথাই নাই। কিন্তু সন্ধানপূর্বক বিবেচনাপূর্বক সংযতচিত্তে স্ত্রী নির্বাচন করিয়া লওয়া ছাড়া ইহার অন্য পন্থা নাই।[২০]

নতুন একটি সামাজিক আদর্শের উদ্বোধন বা বিনির্মাণ চান রবীন্দ্রনাথ। দাম্পত্যে একীকরণ কেবল নয়, নরনারীর প্রেম জাগ্রত করার জন্য সামাজিক চাপের অবসান চান তিনি। দাম্পত্য হবে মানবিক আবেগে সম্পূর্ণ, মনুর নির্দেশে নয়। এখানেও সেই তুলনা ভারতীয় ও ইয়োরোপীয় সমাজের মধ্যে, ইংরেজ আদর্শের দাম্পত্যই যে চরম নিদর্শন সেই বক্তব্যও স্পষ্ট। নৈতিকতা কোনো একীকরণের ভিত্তি হতে পারে না, মনের মিলনই চূড়ান্ত। নরনারীর সামাজিক বৈষম্য বহাল রেখে এই মানসিক মিলন অসম্ভব। রবীন্দ্রনাথ ২৪/১১/১৮৮৮ সালে 'পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক'-এ আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক বাস্তবতা সম্পর্কে নেতিবাচক অভিমত প্রদান করেন। তাঁর মতে, আমাদের কোনো একক সমাজ বা কোনো সমাজই নেই, কেননা নারীরা গৃহে আবদ্ধ থাকতে বাধ্য হচ্ছে। পরিবারে বা পরিবারের বাইরে একক কোনো মানবসমাজ নেই, সে কেবলই পুরুষের। পুরুষে-পুরুষে মিলে একটি বন্ধ্যা সমাজই যেন এখানে তৈরি হয়েছে, আর নারীকে পরিণত করেছে গার্হস্থ্য সামগ্রীতে :

আমাদের স্ত্রীলোকেরা অতি বাল্যকাল হইতে কেবলমাত্র পরিবারের সেবা করিবার জন্য বিশেষরূপে প্রস্তুত হইয়া থাকে। আত্মোৎসর্গ সাধনের জন্য পৃথিবীতে যে-সকল উপায় আছে তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়া তাহারা পরিপূর্ণতা লাভ করিতে পারে না। তাহারা সম্পূর্ণ স্ত্রীলোক হইতে পারে না, তাহারা কেবলমাত্র গার্হস্থ্যের উপাদান সামগ্রী হইয়া উঠে।[২১]

উনিশ শতকীয় সামাজিক বাস্তববাদ দ্বারাই পরিপুষ্ট ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সামাজিক চাপ তিনি আত্মস্থ করেছেন, উপলব্ধি করেছেন মানবিক সত্য। তবু সামন্ত মূল্যবোধের অবশেষ অবচেতনায় সুপ্ত ছিল বলেই মনে হয়, সামাজিক বিশেষ পরিস্থিতির সাপেক্ষে তার প্রকাশ ঘটেছে যা সামগ্রিক রবীন্দ্রানুগ নয়। তিনি ধর্মনিরপেক্ষ যুক্তিনির্ভর উদারপন্থার সঙ্গেই ছিলেন কিন্তু নারীর 'স্বভাব' বা 'প্রকৃতি' বলতে যে চিরায়ত রূপটি তাঁর সামনে উপস্থিত ছিল তার বিপরীত প্রান্তটি অনুভব করতে পারেননি। এর জন্য পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা সর্বৈব দায়ী কী না তা নিয়ে বিতর্ক চলতে পারে, তবে সময়ের দায় অস্বীকার করা যায় না; কেননা তখনো পর্যন্ত নারীর একক দৈহিক অধিকারের প্রসঙ্গটি নারী-বিষয়ক আলোচনায় এসে পৌঁছেনি। আজকে তো বটেই, সমকালীন রবীন্দ্রবিবেচনার প্রেক্ষাপটেও কিছু মন্তব্য আছে সামগ্রিক নারী-বিষয়ক রবীন্দ্রচিন্তায় যা অরাবীন্দ্রিক মনে হয়। এ কথা সত্য, রবীন্দ্রনাথ নারী বা পুরুষ কোনো এক পক্ষের আধিপত্য স্বীকার করতে চাননি। তিনি সম্পূরকতা ধর্মে বিশ্বাসী, নারী-পুরুষ যে প্রকৃতিগতভাবে ভিন্ন এই মতই পোষণ করতেন রবীন্দ্রনাথ। প্রকৃতিতে নারী বা পুরুষ থাকবে, থাকতেই হবে কেননা কোনো এক পক্ষের দ্বারা এককভাবে প্রকৃতি সংরক্ষণ অসম্ভব। এতে পার্থক্য থাকবে, একেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'ক্ষতিপূরণের নিয়ম'। শারীরিকভাবে পুরুষ বলশালী হলেও মেয়েরা রূপে শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধিতে পুরুষ শ্রেষ্ঠ হলেও নারী শ্রেষ্ঠ হৃদয়ের ধর্মে এবং 'তাই স্ত্রী পুরুষ দুই জাতি পরস্পর

পরস্পরকে অবলম্বন করতে পারছে।' কিন্তু পরে রবীন্দ্রনাথ এই সম্পূরকতাকে খুব একটা প্রাধান্য দেননি। কেবল পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে মন্তব্য করে বিতর্ক বাড়িয়েছেন :

> আসল কথা প্রতিভা একটা শক্তি (Energy), তাতে অনেক বল আবশ্যক, তাতে শরীর ক্ষয় করে। তাই মেয়েদের একরকম গ্রহণশক্তি ধারণাশক্তি আছে, কিন্তু সৃজনশক্তির বল নেই। মস্তিষ্কের মধ্যে কেবল একটা বুদ্ধি থাকলে হবে না, আবার সেই সঙ্গে মস্তিষ্কের একটা বল চাই। মেয়েদের একরকম চটপটে বুদ্ধি আছে, কিন্তু সাধারণ পুরুষের মতো বলিষ্ঠ বুদ্ধি নাই। আমার তো এই রকম বিশ্বাস।[২২]

শারীরিক প্রতিবন্ধকতার কারণেও নারীকে পিছিয়ে পড়তে হবে, এমনই বিশ্বাস ছিল রবীন্দ্রনাথের। নারী হাজার পড়াশুনা করলেও কর্মক্ষেত্রে পুরুষের সমানাধিকার শারীরিক দুর্বলতার কারণেই পাবে না। দ্বিতীয় কারণ, নারীদের সন্তান ধারণ ও লালন-পালন করতে হবে, এই কর্মে সময় ব্যয় হওয়ার জন্য তারা পুরুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়বে। রবীন্দ্রনাথের কালে নারীর শারীরিক অধিকার গুরুত্ব পায়নি, আবিষ্কৃত হয়নি গর্ভনিরোধক বিভিন্ন উপায়। ফলে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বক্তব্যে কেবল পুরুষ-কর্তৃত্বের মনোভাবই ধারণ করছেন না, সমকাল বা সমাজমনস্তত্ত্বকেও চিত্রিত করছেন। রবীন্দ্রনাথ শেষপর্যন্ত নারীকে বুদ্ধিতে পুরুষের সমকক্ষ মনে করেননি। তাঁর মতে, অবস্থার বাস্তবতায় মেয়েরা বাইরের কাজ করতে পারবে না, এবং এটিই সম্ভবত প্রাকৃতিক নিয়ম। প্রকৃতিই নারীপুরুষকে সমান করে তৈরি করেনি, প্রকৃতির অভিপ্রায় পৃথকত্ব। তিনি মানেন, 'মেয়েরা কখনোই পুরুষের সঙ্গে (কেবল পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়ে) বুদ্ধিতে সমকক্ষ হবে না।' এই উপলব্ধির পক্ষে তিনি প্রাত্যহিক কাঁচা যুক্তির অবতারণা করেছেন, তেমনি প্রচলিত সংস্কারকেও প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁর মতে, পুরুষের বেশি বুদ্ধির প্রমাণ তারা বুড়ো-আঙুল বেশি ব্যবহার করে, মেয়েরা তা করে না — অতএব মেয়েদের বুদ্ধি কম। বিশেষত মাতৃত্বের কারণে নারী যে পুরুষের সমকক্ষ হতে পারবে না, এই প্রভেদ পুরুষের অত্যাচার নয়, প্রকৃতিরই বিধান। কাজেই 'প্রাণধারণের জন্যে পুরুষের প্রতি তাদের নির্ভর করতেই হবে।' এ-জন্য নারীস্বাধীনতার প্রসঙ্গটিকে তিনি পুরুষের সান্নিধ্য বা আশ্রয় ছিন্ন করা হিসেবে বিবেচনা করেছেন। নারীর দাবিকে তাঁর মনে হয়েছে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা বা কোলাহল; তিনি দ্রোহকে অসঙ্গত মনে করেন :

> অতএব আজকাল পুরুষাশ্রয়ের বিরুদ্ধে যে একটা কোলাহল উঠেছে, সেটা আমার মতে অসংগত এবং অমঙ্গলজনক মনে হয়। পূর্বকালে মেয়েরা পুরুষের অধীনতাগ্রহণকে একটা ধর্ম মনে করত; তাতে এই হত যে, চরিত্রের উপর অধীনতার কুফল ফলতে পারত না, অর্থাৎ হীনতা জন্মাত না, এমন-কি, অধীনতাতেই চরিত্রের মহত্ত্বসম্পাদন করত। প্রভুভক্তিকে যদি ধর্ম মনে করে তা হলে ভৃত্যের মনে মনুষ্যত্বের হানি হয় না।[২৩]

রবীন্দ্রনাথ নারীর নির্বিচার স্বাধীনতাকে মেনে নেননি বা মেনে নিতে চাননি; তাঁর মনে হয়েছে 'নানা দিক থেকে দেখা যাচ্ছে, সংসারের কল্যাণ অব্যাহত রেখে স্ত্রীলোক কখনো পুরুষের আশ্রয় ত্যাগ করতে পারে না।' এ ছাড়াও 'নারীপ্রকৃতি' নামে একটি প্রসঙ্গের উপস্থাপন রবীন্দ্রনাথ বার বার করছেন যার দ্বারা নারী সংসারে আবদ্ধ। এই নারীপ্রকৃতি হচ্ছে মাতৃত্ব ও স্ত্রীত্ব; রবীন্দ্রনাথের মতে, প্রকৃতিই নারীকে কেবল ধর্মবুদ্ধিতে নয় কর্তব্যে

সংসারে নির্ভর করে রেখেছে এবং 'পতিভক্তি বাস্তবিকই স্ত্রীলোকের পক্ষে ধর্ম।' রবীন্দ্রনাথ নারীশিক্ষার বিরোধী নন, সেই শিক্ষা এই জন্য যে, নারীরা যাতে বুদ্ধিতে উন্নতি করতে পারে, এতে সংসারই লাভবান হবে। রবীন্দ্রনাথ এও মনে করেন, শিক্ষিত হলেও 'পুরুষ সম্পূর্ণ স্ত্রী এবং স্ত্রী সম্পূর্ণ পুরুষ হতে পারবে না এবং না হলেই বাঁচা যায়।' এই মন্তব্যে শ্লেষ অস্পষ্ট নয়। রমাবাই যে বলেছেন সুবিধে পেলে নারীরা পুরুষের সব কাজই করতে পারে, এই নিয়েই মূলত অপ-বিতর্ক করেছেন রবীন্দ্রনাথ।

উনিশ শতকের শেষ দশকে সমগ্র ভারতবর্ষই আত্মসন্ধানে ব্যাপৃত হতে গিয়ে অন্তত একবার প্রাচীন ভারতে পিছিয়ে যাবার চেষ্টা করেছে। এর মধ্যে ইংরেজ প্রাধান্য অস্বীকারের আগ্রহ প্রধানত থাকলেও কালক্রমে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ইতিবাচক ফল বয়ে আনেনি। সামাজিক-রাজনৈতিক এই প্রবণতা রবীন্দ্রনাথকেও স্পর্শ করেছে, তিনিও প্রতীচ্যের জীবনগতির মধ্যে লক্ষ করেছেন উদ্দেশ্যহীনতার সংকট। তিনি অনুভব করেছিলেন, প্রাণের কেন্দ্রের মতো সেখানে সমাজের কেন্দ্রও হারিয়ে যাচ্ছে। চাওয়া ও পাওয়ার যে সংস্কৃতি চালু হয়েছে সেখানে ভালোবাসার কোনো স্থান নেই। প্রাণের আবেগ যাচ্ছে ক্ষয়ে, নারী বা পুরুষ কেউই আর সুস্থির বন্ধনকে স্বীকার করছে না। নারীকে রবীন্দ্রনাথ মনে করেছেন সমাজের কেন্দ্রানুগ শক্তি যারা বহির্মুখী অস্থির কর্মচঞ্চল বা যুদ্ধংদেহী পুরুষকে স্বস্তিতে, শমে বা প্রাণে ফিরিয়ে আনে। কিন্তু পাশ্চাত্যের বাণিজ্যলোভী লক্ষ্মীমন্ত নয়, কুবেরের ধনসঞ্চয়ী সমাজ কেবল পুরুষকে নয়, নারীকেও পথে নামাচ্ছে; নারীও পেতে চাইছে পুরুষের স্বভাব। এর একটি বিপরীত চিত্র রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্যের সমাজে অনুভব করেছেন; এখানে নারী 'সিঁদুরের রেখা কেটে সদাপ্রসন্নমুখে স্নেহ প্রেম কল্যাণে আমাদের গৃহ মধুর করে রেখেছেন।' রবীন্দ্রনাথের মতে, 'আমরা গৃহে সুখী'। ইয়োরোপের ও ভারতীয় নারীর অবস্থানের তুলনা করে সুখের বৃত্তান্তও জানাচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ : 'ইংরেজরা মনে করতে পারেন লনটেনিস না খেললে এবং 'বলে' না নাচলে স্ত্রীলোক সুখী হয় না, কিন্তু আমাদের দেশের লোকের বিশ্বাস, ভালোবেসে এবং ভালোবাসা পেয়েই স্ত্রীলোকের প্রকৃত সুখ।' এই অপ্রয়োজনীয় উত্তেজনা থেকে মুক্ত হতে পারেননি রবীন্দ্রনাথ। ভারতের আসন উচ্চে তুলে ধরতে গিয়ে ইয়োরোপকে টেনে নামানোর চেষ্টা করতে হয়েছে তাঁকে। রবীন্দ্রনাথের মতে, ইয়োরোপে নয় ভারতবর্ষেই নারীজীবন চরিতার্থতা লাভ করে। ইয়োরোপীয় চিরকুমারীর সঙ্গে ভারতীয় বালবিধবার তুলনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর মতে, ইয়োরোপে চিরকুমারীর জীবন প্রাণহীন শুষ্ক নীরস, কিন্তু ভারতবর্ষে বালবিধবা তেমন নয় :

> আমাদের বিধবা নারীপ্রকৃতি কখনো শুষ্ক শূন্য পতিত থেকে অনুর্বরতা লাভের অবসর পায় না। তাঁর কোল কখনো শূন্য থাকে না, বাহু দুটি কখনো অকর্মণ্য থাকে না, হৃদয় কখনো উদাসীন থাকে না। তিনি কখনো জননী কখনো দুহিতা কখনো সখী। এইজন্যে চিরজীবনই তিনি কোমল সরস স্নেহশীল সেবাতৎপর হইয়া থাকেন।... বরং একজন বিবাহিতা রমণীর বিড়ালশাবক এবং ময়না পোষবার প্রবৃত্তি এবং অবসর থাকে, কিন্তু বিধবাদের হাতে হৃদয়ের সেই অতিরিক্ত কোণটুকুও উদ্‌বৃত্ত থাকতে প্রায় দেখা যায় না।[২৪]

রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় সমাজে বিধবার জন্য সমাজবন্ধন বা পরিবারকে বিবেচনা করেছেন একটি আশ্রয় হিসেবে। তাঁর মতে, কথিত স্বাধীনতা নারীর জন্য অপ্রয়োজনীয়; প্রাচীন

ভারতীয় সংহিতা-রচয়িতার মতোই রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'ভালোবাসাহীন বন্ধনহীন শূন্য স্বাধীনতা নারীর পক্ষে অতিভয়ানক, মরুভূমির মধ্যে অপর্যাপ্ত স্বাধীনতা গৃহীলোকের পক্ষে যেমন ভীষণ শূন্য।' নারী শেষপর্যন্ত পুরুষের নিয়ন্ত্রণ, শাসন, রক্ষণাবেক্ষণ বা আশ্রয়ে থাকবে। তবে মানবিক উন্নয়নের জন্য রবীন্দ্রনাথও পরিবর্তনের পক্ষে, তবে সেটা কেবল ভারতবর্ষে নয় ইয়োরোপেও।

ভারতীয় জীবন সমাজনির্ভর। সামাজিক চাপে বা প্রয়োজনে এখানে বাল্যবিবাহ ঘটে বা বিধবাবিবাহ ঘটে না। নারীর অবস্থান নির্ধারণের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ সমাজমনস্তত্ত্বকেই দায়ী করেছেন। নারীর অবস্থান পরিবর্তন করতে হলে সমাজেরও পরিবর্তন বা সংস্কার প্রয়োজন। নারীর শিক্ষার দাবির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ একাত্ম, তবে তা সামাজিক সম্মতি সাপেক্ষে। তাঁর মতে, হিন্দু সমাজ যেহেতু কতিপয় নীতি বা বিধির দ্বারা পরস্পর সংলগ্ন বা সংবদ্ধ, তাই কোনো নতুন বিষয় উপস্থাপনের পূর্বে পুরাতন রীতিগুলো পরীক্ষা করে নেওয়া দরকার। তা না হলে একটি নতুন বিষয়ের আবির্ভাবে সমগ্র সমাজটিই ভাঙনের শঙ্কায় পড়তে পারে। রবীন্দ্রনাথের মতে, ভাঙনটি অনিবার্য কিন্তু ধারা বজায় রেখে ভাঙতে হবে। তাঁর মতে, 'রীতিমত স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত করিতে গেলে বাল্যবিবাহ তুলিয়া দিতে হয়। বাল্যবিবাহ গেলে ক্রমশই স্বাধীনবিবাহ আসিয়া পড়ে। স্বাধীনবিবাহ প্রচলিত করিতে গেলে সমাজের বিস্তর রূপান্তর অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে এবং জাতিভেদের মূল ক্রমে জীর্ণ হইয়া আসে।'[২৫] তবে রবীন্দ্রনাথ নিশ্চিতভাবেই জানেন, নারীশিক্ষা বন্ধ করার কোনো উপায় নেই। নারীবিষয়ক বিবেচনায় রবীন্দ্রচিন্তায় বিশেষ গুরুত্বের সূচনা ঘটেছে এর দ্বারা। *পঞ্চভূত* (১৩০৪) গ্রন্থের 'নরনারী' (চৈত্র ১২৯৯) প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ পুরুষের তুলনায় মানসজগতে নারীর প্রাধান্যের কথা স্বীকার করেছেন; 'মানসজগতে স্ত্রীলোকের প্রভাব অধিক, কার্যজগতে পুরুষের প্রভুত্ব। যেখানে কেবলমাত্র হৃদয়বৃত্তির কথা সেখানে পুরুষ স্ত্রীলোকের সহিত পারিয়া উঠিবে কেন? কার্যক্ষেত্রেই তাহার চরিত্রের যথার্থ বিকাশ হয়।' নারী কর্মক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ, নারীর অবস্থানই কর্মক্ষেত্রে। পুরুষ যেখানে 'যোগী, উদাসীন, নির্জনবাসী' নারী তার বিপরীত; নারী স্বভাবতই কার্যমুখী জ্ঞানের চর্চা করে। নারী ও কর্ম একাত্ম হতে পারে, কাজের মধ্যে কোনো ব্যবধান থাকে না; 'সে একেবারে কাজের মধ্যে লিপ্ত, জড়িত। সেই যথার্থ লোকালয়ে বাস করে, সংসার রক্ষা করে।' 'আমি' নামের রবীন্দ্রচরিত্রটি স্পষ্টভাবেই বলতে চায় 'আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা আমাদের পুরুষের চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ।' এর প্রমাণ ও দৃষ্টান্ত দিয়েছেন উপমার মাধ্যমে :

> প্রমাণ ঘরে ঘরে। প্রমাণ অন্তরের মধ্যে। পশ্চিমে ভ্রমণ করিবার সময় কোনো কোনো নদী দেখা যায়, যাহার অধিকাংশে তপ্ত শুষ্ক বালুকা ধূ ধূ করিতেছে — কেবল এক পার্শ্ব দিয়া স্ফটিকস্বচ্ছসলিলা স্নিগ্ধ নদীটি অতি নম্রমধুর স্রোতে প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে। সেই দৃশ্য দেখিলে আমাদের সমাজ মনে পড়ে। আমরা অকর্মণ্য, নিষ্ফল নিশ্চল বালুকারাশি স্তূপাকার হইয়া পড়িয়া আছি, প্রত্যেক সমীরশ্বাসে হুহু করিয়া উড়িয়া যাইতেছি এবং যে-কোনো কীর্তিস্তম্ভ নির্মাণ করিবার চেষ্টা করিতেছি তাহাই দুই দিনে ধসিয়া ধসিয়া পড়িয়া যাইতেছে। আর আমাদের বাম পার্শ্বে আমাদের রমণীগণ নিম্নপথ দিয়া বিনম্র সেবিকার মতো আপনাকে সংকুচিত করিয়া স্বচ্ছ সুধাস্রোতে প্রবাহিত হইয়া চলিতেছে। তাহাদের এক মুহূর্ত বিরাম নাই। তাহাদের গতি, তাহাদের প্রীতি, তাহাদের সমস্ত জীবন, এক ধ্রুব লক্ষ্য ধরিয়া অগ্রসর

> হইতেছে। আমরা লক্ষ্যহীন, ঐক্যহীন, সহস্রপদতলে দলিত হইয়াও মিলিত হইতে অক্ষম। যে দিকে জলস্রোত, যে দিকে আমাদের নারীগণ, কেবল সেই দিকে সমস্ত শোভা এবং ছায়া এবং সফলতা, এবং যে দিকে আমরা সে দিকে কেবল মরুচাকচিক্য, বিপুল শূন্যতা এবং দগ্ধ দাস্যবৃত্তি।[২৬]

পঞ্চভূতের অন্যতম চরিত্র সমীরও এই মত পোষণ করে; জানায় পুরুষেরা দুর্বল বলেই কেবল অন্তঃপুরে আধিপত্য বিস্তার করতে চায়, দেবতা হতে চায়। কিন্তু দেবতা হওয়া যায় না, কেবল অন্তঃসারশূন্যতাই স্পষ্ট হয়। পঞ্চভূতের আরেক চরিত্র দীপ্তির বক্তব্যও এই প্রসঙ্গেই, আরো শ্লেষাত্মক : 'হায় হায়, বাঙালির মেয়ে পূর্বজন্মে কত পুণ্যই করিয়াছিল তাই এমন দেবলোকে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে! কী বা দেবতার শ্রী! কী বা দেবতার মাহাত্ম্য!' রবীন্দ্রনাথ শিক্ষিত নারীর সমাজে আরো ভূমিকা রাখার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এর দ্বারা সমাজ-পরিবার আরো উপকৃত হবে :

> যে গৃহে লক্ষ্মী আছে, সে গৃহে বিশৃঙ্খলা কুশ্রীতা নাই। আজকাল আমরা যে-সমস্ত অনুষ্ঠান করিতেছি তাহার মধ্যে লক্ষ্মীর হস্ত নাই, এই জন্য তাহার মধ্যে বড়ো বিশৃঙ্খলা, বড়ো বাড়াবাড়ি — তোমরা শিক্ষিতা নারীরা তোমাদের হৃদয়ের সৌন্দর্য লইয়া যদি এই সমাজের এই অসংযত কার্যস্তূপের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াও তবেই ইহার মধ্যে লক্ষ্মীস্থাপনা হয়, তবে অতি সহজেই সমস্ত শোভন পরিপাটি এবং সামঞ্জস্যবদ্ধ হইয়া আসে।[২৭]

রবীন্দ্রনাথ মূলত প্রকৃতিগত বৈচিত্র্যে ঐক্য সন্ধান করেছেন। নরনারীর স্বভাবের বিভিন্নতার ক্ষেত্রে সমাজে ঐক্য ও মঙ্গল হতে পারে কেবল সম্মিলনের ধর্মে। এখানে ক্ষুদ্র বা বৃহতের কোনো বিরোধ থাকতে নেই, সম্পূরকতার ধর্মে একে অন্যকে সহায়তা করলেই একক মানব বা একক বিশ্বের সৃষ্টি হবে। দুই পৃথক প্রকৃতি ও কর্ম মিলিয়ে মানব — নরনারী সম্পর্কে এই অভিমত রবীন্দ্রনাথের :

> পুরুষের জীবনের ক্ষেত্র বৃহৎ সংসারে, সেখানে সাধারণ মানুষের ভুলচুক-ত্রুটি পরিমাণে হইয়াই থাকে। বৃহতের উপযুক্ত শক্তি সাধনাসাপেক্ষ, কেবলমাত্র সহজ বুদ্ধির জোরে সেখানে ফল পাওয়া যায় না। স্ত্রীলোকের জীবনের ক্ষেত্র ছোটো সংসারে, সেখানে সহজ বুদ্ধিই কাজ চালাইতে পারে। .... যথার্থ পুরুষ হওয়া সহজ নয়, তাহা দুর্মূল্য বলিয়াই দুর্লভ। আদর্শ নারীর উপকরণ-আয়োজন অনেকখানিই জোগাইয়াছে প্রকৃতি। প্রকৃতির আদুরে সন্তান নয় পুরুষ, বিশ্বের শক্তিভাণ্ডার তাহাকে লুঠ করিয়া লইতে হয়। ... মেয়েরা সেখানেই ত্যাগ করে যেখানে তাহাদের প্রবৃত্তি ত্যাগ করায়, তাহাদের সন্তানের জন্য, প্রিয়জনের জন্য। পুরুষের যথার্থ ত্যাগের ক্ষেত্র প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে। একথা মনে রাখিয়া দুই জাতের তুলনা করিয়ো।[২৮]

এখানে সুপ্ত আধিপত্যের মনোভাব থাকতে পারে, তবে তা সচেতন নয়। বরং প্রকৃতি যেমন অখণ্ড, নারীপুরুষের সম্মিলনেও তেমনি অখণ্ড সত্তার আবির্ভাব ঘটবে বলেই রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস। এক্ষেত্রে নারীর প্রাধান্যই স্বীকৃত, তার স্বরূপেই আছে অখণ্ডতা; রবীন্দ্রনাথ জানাচ্ছেন : 'রমণীও প্রকৃতির মতো। মন আসিয়া মাঝখান হইতে দুই ভাগ করিয়া দেয় নাই। সে পুষ্পের মতো আগাগোড়া একখানি।'[২৯] এ জন্যই নারীর গতিবিধি আচারব্যবহার এমন সহজসম্পূর্ণ এবং অনেকাংশে দ্বিধান্দোলিত পুরুষের পক্ষে নারী 'মরণং ধ্রুবং'। নারীর অন্তরে আছে প্রবল ইচ্ছাশক্তির প্রাধান্য, পুরুষের বহির্মুখ সামাজিক যুক্তির সঙ্গে তার

বিরোধ। কেবল এইসূত্রে রবীন্দ্রনাথ নারীপুরুষের স্বভাবের পার্থক্য নিরূপণ করতে চেয়েছেন, সেই স্বভাব অনুয়ায়ী সমাজে তাদের কর্মবিভাজনও করতে চেয়েছেন। প্রকৃতিরই ভেতরে বাইরের দুটি রূপের সঙ্গে নারী-পুরুষকে তুলনা করেছেন তিনি। মানুষের মনেরও দুটি অংশ স্বীকার করেছেন, সচেতন ও অচেতন অংশ। এখানেও নারী-পুরুষের তুলনা আছে। একটি চঞ্চল, গতিশীল; অপরটি গুপ্ত অথচ সঞ্চয়শীল। এই রূপকটির দ্বারা সম্ভবত সৃষ্টিশীলতার সূত্রে নারীর দিকেই ভরকেন্দ্র স্থাপন করেন রবীন্দ্রনাথ। এই রূপকটি নিম্নরূপ :

> রূপকে যদি কাহারও আপত্তি না থাকে তবে আমি বলি আমাদের এই চঞ্চল বহিরংশ পুরুষ, এবং এই বৃহৎ গোপন অচেতন অন্তরংশ নারী।
> এই স্থিতি এবং গতি সমাজে স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে ভাগ হইয়া গিয়াছে। সমাজের সমস্ত আহরণ, উপার্জন, জ্ঞান ও শিক্ষা স্ত্রীলোকের মধ্যে গিয়া নিশ্চল স্থিতি লাভ করিতেছে। ... পুরুষ উপস্থিত আবশ্যকের সন্ধানে সময়স্রোতে অনুক্ষণ পরিবর্তিত হইয়া চলিতেছে, কিন্তু সেই সমুদয় চঞ্চল প্রাচীন পরিবর্তনের ইতিহাস স্ত্রীলোকের মধ্যে স্তরে স্তরে নিত্য ভাবে সঞ্চিত হইতেছে।
> পুরুষ আংশিক, বিচ্ছিন্ন, সামঞ্জস্যহীন। আর স্ত্রীলোক এমন একটি সংগীত যাহা সমে আসিয়া সুন্দর সুগোল ভাবে সম্পূর্ণ হইতেছে; ... প্রকৃতিতে যাহা সৌন্দর্য, মহৎ ও গুণী লোকে তাহাই প্রতিভা, এবং নারীতে তাহাই শ্রী, তাই নারীত্ব। ইহা কেবল পাত্রভেদে ভিন্ন প্রকাশ।[৩০]

একেই বলে নারীশক্তি, এ অন্তস্থ ও অনিবার্য সৃষ্টিশীল। এ প্রাণের টান নারী অনুভব করে সংরক্ষণে, স্থিতিতে ও কল্যাণে। এখানে পৌরুষের দৃশ্যমান পেশিশক্তি নেই, আছে সঞ্জীবনী রক্তধারা। রবীন্দ্রনাথের মতে, সমাজের বীরপুরুষেরা প্রায়শ নারীর শক্তিমত্তা বুঝতে পারে না, কেবল মোহ অনুভব করে এবং নিজেরই ভুলের পাঁকে তলিয়ে যেতে থাকে। বিহারীলাল চক্রবর্তীর কবিতা আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ নরনারীর স্বভাব-পার্থক্যের ব্যাপারটি স্বীকার করেছেন। তাঁর মতে, নরনারীর মধ্যে এই পার্থক্য প্রাকৃতিক। এই বক্তব্যে দৃশ্যমানভাবে সংস্কারকেই যেন প্রাধান্য দেয়া হল, বিদ্যমান ব্যবস্থাটিকে যেন স্বীকার বা মেনে নেওয়া হল, কিন্তু রবীন্দ্রচিন্তায় যে 'বৈচিত্র্যে ঐক্য'-বোধ, তার প্রেক্ষাপটে ইতিবাচক ফল পাওয়া সম্ভব :

> আমাদের [মানব] প্রকৃতির মধ্যে একটি বন্ধন-অসহিষ্ণু স্বেচ্ছাবিহারপ্রিয় পুরুষ এবং একটি গৃহবাসিনী অবরুদ্ধ রমণী দৃঢ় অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া আছে। একজন জগতের সমস্ত নূতন নূতন দেশ, ঘটনা এবং অবস্থার মধ্যে নব নব রসাস্বাদ করিয়া আপন অমর শক্তিকে বিচিত্র বিপুলভাবে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিবার জন্য সর্বদা ব্যাকুল, আর-একজন শতসহস্র অভ্যাসে বন্ধনের প্রথায় প্রচ্ছন্ন এবং পরিবেষ্টিত। একজন বাহিরের দিকে লইয়া যায়, আর-একজন গৃহের দিকে টানে।[৩১]

এই সম্পর্ক সমন্বয়ের, দূরান্বয় থাকলে চলবে না। বিশ্বসংসারের প্রেক্ষাপটে সব কাজ সুচারুভাবে নিষ্পন্নের বাস্তবতায় রবীন্দ্রনাথ নারীর ক্ষমতাকেই বলেছেন 'গৃহিণীপনা'। বঙ্কিমচন্দ্রের *রাজসিংহ* উপন্যাস আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ নারীচরিত্রের দ্রুত ও একাগ্র স্বভাববৈশিষ্ট্য সম্পর্কে লিখেছেন : 'স্ত্রীলোক যখন কাজ করে তখন এমনি করিয়াই কাজ

করে; তাহার সমগ্র মনপ্রাণ লইয়া বিবেচনা চিন্তা বিসর্জন দিয়া একেবারে অব্যবহিতভাবে উদ্দেশ্যসাধনে প্রবৃত্ত হয়।'[৩২]

রবীন্দ্রনাথ ভারত বা প্রাচ্যদেশের সঙ্গে ইয়োরোপের পার্থক্য গভীরভাবে অনুভব ও তা বিভিন্ন লেখায় প্রকাশও করেছেন। এই প্রকাশে কোনো কোনো সময় ভারতীয় অহং প্রাধান্য পাওয়া স্বাভাবিক। বিশেষত উনিশ শতকের শেষ দশকে এই প্রবণতা বেশিই ছিল। পুবদেশীয় সমাজ ও পরিবার সম্পর্কে ইয়োরোপীয়রা যে যথেষ্ট অবহিত নয় এটি প্রমাণ করা ও ভারতীয় ভালোত্ব প্রতিষ্ঠার তাগিদ রবীন্দ্রনাথকেও আলোড়িত করেছিল। এমনি এক প্রবণতায় রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় সমাজে ও পরিবারে নারীর অবস্থান সম্পর্কেও আরো কিছু মন্তব্য করেছেন। তাঁর মতে, এখানে নরনারী কুলবন্ধনে আবদ্ধ, ভারতে কুলত্যাগ ভয়ংকর পরিণাম ডেকে আনে যা ইয়োরোপে অনুভূত হয় না। ইয়োরোপে কেবল দাম্পত্যসম্পর্কই দৃঢ়, পরিবারের অন্যান্য সম্পর্কের বন্ধন দৃঢ় নয়। এই দৃঢ় বন্ধনের প্রেক্ষাপটেই রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় সমাজে নারীর অবস্থান ও ভূমিকা বিবেচনা করতে চেয়েছেন :

> ... ইংরেজ-পরিবারে দাম্পত্যবন্ধন ছাড়া অন্য কোনো বন্ধন দৃঢ় নহে। এইজন্য হিন্দুসমাজে বিধবাবিবাহ বৈধ হইয়াও সমাজে প্রচলিত হইল না। কারণ, জীবিত প্রাণী যেমন তাহার কোনো সজীব অঙ্গ পরিত্যাগ করিতে পারে না, হিন্দুপরিবারও সেইরূপ বিধবাকে ত্যাগ করিয়া নিজেকে বিক্ষত করিতে প্রস্তুত নহে। বাল্যবিবাহও হিন্দুপরিবার এইজন্যই শ্রেয়োজ্ঞান করে। কারণ, প্রেমসঞ্চারের উপযুক্ত বয়স হইলেই স্ত্রীপুরুষে মিলন হইতে পারে, কিন্তু সমস্ত পরিবারের সঙ্গে একীভূত হইবার বয়স বাল্যকাল।[৩৩]

আত্মগৌরব অনুভব করতে গিয়ে অনেকসময় উত্তেজনা তৈরি হতে পারে। রবীন্দ্রনাথের বিদেশির মুখে স্বদেশ নিন্দা সহ্য হয়নি। রবীন্দ্রনাথও মানেন বিধবাবিবাহ নিষেধ ও বাল্যবিবাহ ক্ষতিকর হতে পারে, কিন্তু ভারতীয় সমাজের বিশিষ্টতায় তার উদ্ভব ঘটেছে সেটিও বুঝতে হবে। নির্বিচার নিন্দার তিনি ঘোর বিরোধী। তিনি সমাজসাপেক্ষে নারী-পুরুষকে বিবেচনা করতে চেয়েছেন, তবে মানবিক একটি মানদণ্ডের প্রতিই তাঁর আগ্রহ। তুলনামূলক বিচারে তা ধরা পড়ে : 'বিলাতি সমাজে কন্যাকে অধিক বয়স পর্যন্ত কুমারী রাখার প্রতি আমরা কটাক্ষ করি; ... অথচ বালবিধবাকে চিরজীবন অবিবাহিত রাখা তদপেক্ষা আশঙ্কাজনক, সেকথা আমরা বিচারের মধ্যেই আনি না। ... কিন্তু আসল কথা, এ-সকল নিয়ম কোনো নীতিতত্ত্ব হইতে উদ্ভূত হয় নাই, প্রয়োজনের তাড়নে দাঁড়াইয়া গেছে।' রবীন্দ্রনাথ সামগ্রিক ভাঙনের আগ্রহ নিয়েই অপেক্ষা করেছেন, ভাঙতে হলে সামগ্রিকভাবেই তিনি ভাঙতে চান।

নারীমুক্তির আবশ্যক ও অবশ্যম্ভাবিতা স্বীকার করেও রবীন্দ্রনাথ সমাজসাপেক্ষে বার বার দোলাচলের শিকার হয়েছেন। নারীর শ্রেষ্ঠত্ব, অনিবার্যতা, সৃষ্টিশীল ক্ষমতা, প্রাকৃতিক সম্পূরকধর্ম ও বৈচিত্র্যে ঐক্যের বিশিষ্টতা বর্ণনার পরেও তিনি কোনো চকিত মন্তব্যে ফিরে গেছেন বিপজ্জনক পশ্চাদ্‌পদতায়। নারীস্বভাবের দুর্বলতা স্বীকার করে জানাচ্ছেন, নারী 'স্বামীর নিকট হইতে সম্পূর্ণ ঔদাসীন্যের স্বাদবিহীন মৃদুতা অপেক্ষা প্রবল শাসন

ভালোবাসে'।[৩৪] নারীর ক্ষেত্রে সতীত্বই বড়ো সম্পদ, সাধ্বী নারী কেবল তার স্বামীকেই আকাঙ্ক্ষা করে।[৩৫] নারীর অন্যকে আকর্ষণ করতে হয়, এজন্য তার চাই মোহ তৈরির কৌশল। নারীর এই কাজকে রবীন্দ্রনাথ জেনেছেন হৃদয়ের ধর্ম হিসেবে, এর ব্যবহারে পুরুষের সঙ্গে পার্থক্য তৈরি হয় : 'মেয়েদের কাজ হৃদয়ের কাজ। তাহাদিগকে হৃদয় দিতে হয় এবং হৃদয় আকর্ষণ করিতে হয়; এইজন্য তাহাদিগকে নিতান্ত সোজাসুজি, সাদাসিধা ছাঁটাছোঁটা হইলে চলে না। পুরুষদের যথাযথ হওয়া আবশ্যক, কিন্তু মেয়েদের সুন্দর হওয়া চাই।'[৩৬] এই সৌন্দর্য হ্রী ও শ্রী এবং অনুকরণের অতীত। তবে রবীন্দ্রনাথ নারীর এই মোহময় ব্যবহারকে অতিক্রমণের পথ দেখিয়েছেন কর্মের দ্বারা। বঙ্গভঙ্গের কালে যে রাজনৈতিক আন্দোলন চলেছিল সে-সময় সমাজের অন্যদের সঙ্গে নারীকেও এই পথে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। দেশের আহ্বান তিনি অন্তঃপুরেও স্থান দিতে বলেছেন। নারী এগিয়ে আসবে তারই পরিমণ্ডলের কর্ম ও উদ্দীপনা নিয়ে। কোনো এক নারীর জবানিতে লেখায় রবীন্দ্রনাথ নারীকে আহ্বান জানিয়েছেন সেবাব্রত গ্রহণের জন্য; লিখেছেন, সংকটকালে ত্যাগের শক্তিই বড়ো, নারী সেই ত্যাগ করতে জানে; 'স্ত্রীলোক কেবল সৌন্দর্য দ্বারা মনোহরণ করে নাই, ত্যাগের দ্বারা শক্তি দেখাইয়াছে। আজ আমাদের বঙ্গদেশ রাজশক্তির আঘাতে বিক্ষত হইয়াছে, আজ বঙ্গরমণীদের ত্যাগের দিন।' নারীর শক্তির উৎস যে সেবাব্রত এই নিয়েই রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ :

> আমাদের দেশের নারীগণ আত্মীয়স্বজনের আরোগ্যকামনা করিয়া দীর্ঘকালের জন্য কৃচ্ছ্রব্রত গ্রহণ করিয়া আসিয়াছেন। নারীদের সেই তপঃসাধন বাঙালির সংসারে যে নিষ্ফল হইয়াছে তাহা আমি মনে করি না। আজ আমরা দেশের নারীগণ দেশের জন্য যদি সেইরূপ ব্রত গ্রহণ করি, যদি বিদেশের বিলাস দৃঢ় নিষ্ঠার সহিত পরিত্যাগ করি, তবে আমাদের এই তপস্যায় দেশের মঙ্গল হইবে — তবে এই স্বস্ত্যয়নে আমরা পুণ্যলাভ করিব এবং আমাদের পুরুষগণ মুক্তিলাভ করিবেন।[৩৭]

রবীন্দ্রনাথ মাতৃত্বকে সর্বদাই গুরুত্ব দিয়েছেন; তাঁর নিকট নারীত্বের চরম সার্থকতা মাতৃত্বে, মাতৃত্বের সৌন্দর্য বিশেষভাবে অঙ্কিত হয়েছে ভারতীয় সাহিত্যে; ইয়োরোপীয়রা এই রসাস্বাদ পায়নি বলেই মনে করেন।[৩৮] এটি সংস্কার হলেও সৃষ্টিশীল বোধের সঙ্গে সম্পর্কিত। এর সঙ্গে অবচেতনারও সম্পর্ক থাকতে পারে, যেমন আছে সতীলক্ষ্মীর সংস্কার : 'গৃহস্থঘরের প্রাত্যহিক কাজকর্মের তুচ্ছতার মধ্যে কল্যাণের সেই-যে দিব্যমূর্তি আমরা ক্ষণে ক্ষণে দেখিয়াছি সেই দেখার স্মৃতি তো মনের মধ্যে কেবল আবছায়ার মতো ভাসিয়াই বেড়াইতেছে।'[৩৯] নারী ইতিবাচকভাবেও উদ্ধৃত হতে পারে, সেই দৃষ্টান্তও দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন উপনিষদ কেবল ঋষিদের কণ্ঠস্বর অর্থাৎ পুরুষের; কিন্তু সেখানে একটি মাত্র নারী কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়েছে এবং তা বিলীন হয়ে যায়নি। সেই কণ্ঠস্বর যাজ্ঞবল্ক্যের স্ত্রী মৈত্রেয়ীর। মানুষের মধ্যে যে পুরুষের কণ্ঠস্বর আছে তার প্রকাশ উপনিষদে প্রায়শ আছে, তবে নারী-কণ্ঠস্বরটিই প্রথম জানতে চেয়েছে 'অমৃত' সম্পর্কে, চেয়েছে অমৃত হতে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন 'আমাদের অন্তর-প্রকৃতির মধ্যে একটি নারী রয়েছেন। এই নারীস্বর চায় জীবনের অমৃত, জীবনের স্পর্শ; রবীন্দ্রনাথের মতে, এই অমৃত 'প্রেম'। নারীস্বরূপা প্রেমময় সত্তাকেই আহ্বান করছেন রবীন্দ্রনাথ : 'উপনিষদে

পুরুষের কণ্ঠে আমরা অনেক গভীর উপলব্ধির কথা পেয়েছি, কিন্তু কেবল স্ত্রীর কণ্ঠেই এই প্রথম গভীর প্রার্থনা লাভ করেছি। আমরা যথার্থ কী চাই অথচ কী নেই, তার একাগ্র অনুভূতি প্রেমকাতর রমণীহৃদয় থেকেই অতি সহজে প্রকাশ পেয়েছে।'[৪০] জীবনে প্রেম ও সতী নারীর আকাঙ্ক্ষা করেছেন রবীন্দ্রনাথ, যদিও তা রূপকার্থ : 'আমরা যে প্রেমের সাধনা করব সে সতী স্ত্রীর সাধনা। তাতে সতীর তিন লক্ষণই থাকবে — তাতে হ্রী থাকবে, ধী থাকবে এবং শ্রী থাকবে। ...হ্রী দ্বারাই সতী স্ত্রী আপনার প্রেমকে ধারণ করে, তাকে বিকীর্ণ করে দেয় — এইরূপে সে-প্রেম কাউকে দগ্ধ করে না, সকলকে আলোকিত করে। ... অসতীর যে প্রেমে হ্রী নেই, সংযম নেই, সে প্রেম নিজেকে পরিমিতভাবে সর্বত্র বিকীর্ণ করতে পারে না, সে প্রেম এক জায়গায় উগ্রজ্বালা এবং ঠিক তার পাশেই তেজোহীন আলোকবঞ্চিত ঔদাসীন্য বিস্তার করে।'[৪১] নারীর সতী রূপটি সংসারেই বিচার্য : 'কর্মযোগের একটি লৌকিক রূপ পৃথিবীতে আমরা দেখেছি। সে হচ্ছে পতিব্রতা স্ত্রীর সংসারযাত্রা। সতী স্ত্রীর সমস্ত সংসার কর্মের মূলে আছে স্বামীর প্রতি প্রেম; স্বামীর প্রতি আনন্দ। এইজন্য সংসারকর্মকে তিনি স্বামীর কর্ম জেনেই আনন্দ বোধ করেন — কোনো ক্রীতদাসীও এমন করে কাজ করতে পারে না।'[৪২] আধ্যাত্মিক বিষয়ের বর্ণনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ প্রায়শ পতিব্রতা নারীর উপমান ব্যবহার করেছেন : 'আত্মা পতিব্রতা স্ত্রীর মতো; তার সমস্ত দেহ মন প্রাণ আপনার স্বামীকে নিয়েই সত্য হয়। তার স্বামীই তার প্রিয় আত্মা, তার সত্য আত্মা, তার পরম আত্মা।'[৪৩]

নারীশিক্ষা নিয়ে ভারতবর্ষে বিতর্ক কম নয়, রবীন্দ্রনাথও বিষয়টি দ্বারা আলোড়িত হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাকে বিবেচনা করেছেন জানবার যোগ্যতা হিসেবে; এই যোগ্যতা কেবল পুরুষ নয় নারীরও অর্জন করবার অধিকার আছে। শিক্ষার সঙ্গে নারীপুরুষের বা কেবল নারীত্বের কোনো ভেদাভেদ লক্ষ করেন না রবীন্দ্রনাথ; তবে নারী ও পুরুষের কর্মক্ষেত্র ভিন্ন। এর বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ তাকে গ্রহণ করতে পারেননি রবীন্দ্রনাথ : 'মেয়েদের শরীরের এবং মনের প্রকৃতি পুরুষের প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র বলিয়াই তাহাদের ব্যবহারের ক্ষেত্র স্বভাবতই স্বতন্ত্র হইয়াছে। আজকাল বিদ্রোহের ঝোঁকে এক দল মেয়ে এই গোড়াকার কথাটাই অস্বীকার করিতেছেন।'[৪৪] নারী প্রতিটি ক্ষেত্রেই অবদমিত হচ্ছে এবং এর জন্য দায়ী পুরুষ বা পুরুষতন্ত্র — এই মতটিও রবীন্দ্রনাথ সর্বাংশে মানতে নারাজ। তাঁর মতে, 'আসল কথা এই, স্ত্রী হওয়া, মা হওয়া, মেয়েদের স্বভাব; দাসী হওয়া নয়।' স্নেহ ও প্রেমের বোধ আছে বলেই মেয়েরা মা ও স্ত্রী হয়, দায়ে পড়ে নয়। রবীন্দ্রনাথের মতে, নারীরা ব্যবহারের যে ক্ষেত্রটি দখল করে আছে সেখানে তারা স্বভাবতই স্বয়ং এসেছে, বাইরের কোনো অত্যাচার তাদের আনেনি। নারীবাদে যে 'জবরদস্তি বানানো'র প্রসঙ্গ তা রবীন্দ্রনাথ মানছেন না।

রবীন্দ্রনাথ ফ্যাশনদুরস্ত বিজাতীয় পোশাকের নারীদের পছন্দ করেননি; ২৭ বৈশাখ ১৩২৩-এ লিখিত এক পত্রে জানিয়েছেন, বাঙালির মেয়ের ফ্যাশানে একধরনের মস্ত অভাব তাঁর প্রাণে বাজে। এই ফ্যাশানে মেয়েটিকে চোখে পড়ে না, ফ্যাশানটাই বড়ো হয়ে দেখা দেয়। এর বাইরেই নারীর কল্যাণী রূপ, এর জন্য রবীন্দ্রনাথের তৃষ্ণা : 'এমন সময় ফ্যাশানজালমুক্ত সরল সুন্দর স্নিগ্ধ বাঙালি-ঘরের কল্যাণীকে দেখলে তখনই বুঝতে পারি,

এ তো মরীচিকা নয়, স্বচ্ছ গভীর সরোবরের মতো এর মধ্যে একটি তৃষাহরণ পূর্ণতা আপন পদ্মবনের পাড়টি নিয়ে টলমল করছে।'[৪৫] জাপানে অবস্থানকালেও রবীন্দ্রনাথ নারীদের বিশেষভাবে লক্ষ করেছেন। জাপানি নারীরাই যেন সকল চঞ্চলতা ও সৌন্দর্যের উৎস; উপমা ব্যবহার করেছেন 'ভুঁইচাঁপার মতো এরাই দেশের সমস্ত — আর কিছু চোখে পড়ে না।' জাপানে যাবার আগে রবীন্দ্রনাথ জেনেছিলেন সেখানে পুরুষেরা অলস, নারীরাই সকল কর্ম করে। তখন মনে হয়েছিল পুরুষেরা বোধহয় জুলুম করে, কিন্তু দেখলেন তার উল্টো, 'কাজকর্মের হিল্লোলে মেয়েরা আরো বেশি বিকশিত হয়ে উঠেছে।' এই কাজের মুক্ত প্রান্তরেই রবীন্দ্রনাথ নারীর মুক্তিকে অনুভব করেছেন; তোসামারু জাহাজ, ২৭ বৈশাখ ১৩২৩-এ লিখেছেন :

> কেবল বাইরে বেরুতে পারাই যে মুক্তি তা নয়, অবাধে কাজ করতে পাওয়া মানুষের পক্ষে তার চেয়ে বড়ো মুক্তি। পরাধীনতাই সবচেয়ে বড়ো বন্ধন, কাজের সংকীর্ণতাই হচ্ছে সবচেয়ে কঠোর খাঁচা।
>
> এখানকার মেয়েরা সেই খাঁচা থেকে ছাড়া পেয়ে এমন পূর্ণতা এবং আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। তারা নিজের অস্তিত্ব নিয়ে নিজের কাছে সংকুচিত হয়ে নেই; রমণীর লাবণ্যে যেমন তারা প্রেয়সী, শক্তির মুক্তিগৌরবে তেমনি তারা মহীয়সী। কাজই যে মেয়েদের যথার্থ শ্রী দেয়, সাঁওতাল মেয়েদের দেখে তা আমি প্রথম বুঝতে পেরেছিলুম।[৪৬]

রবীন্দ্রনাথ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নারীকে স্বভাবনির্ভর প্রকৃতি হিসেবে বিবেচনা করেছেন, যারা সজ্ঞার উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। এজন্যই তাঁর মতে, নারীরা 'মানুষের মন বোঝে' এবং 'মানুষের সঙ্গে সম্বন্ধ রক্ষা করা'ও তাদের স্বভাবসিদ্ধ। কর্মকুশলতা নারীদের স্বাভাবিক; পুরুষেরা স্বভাবত কুঁড়ে, দায়ে পড়ে তাদের কাজ করতে হয় — 'মেয়েদের মধ্যে একটা প্রাণের প্রাচুর্য আছে যার স্বাভাবিক বিকাশ হচ্ছে কর্মতৎপরতা।' নারী স্বভাবত সংরক্ষণকারিণী ও কর্মতৎপরতাও তাদের স্বভাবজাত। তারা পুরুষের সাহসিকতা নিয়ে নয় আন্তরিকতা নিয়ে জীবনপথে কীর্তিমান। নারীর স্বভাব-স্বাতন্ত্র্যের প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ বার বার উপস্থাপন করেছেন। ভারতীয় নারীবোধের সংশ্লিষ্টতায় ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯২৪-এ রবীন্দ্রনাথ লিখছেন :

> পুরুষের আছে বীর্য আর মেয়েদের আছে মাধুর্য, এ কথাটা সব দেশেই প্রচলিত। আমরা তার সঙ্গে আরো একটা কথা যোগ করেছি, আমরা বলি মেয়েদের মধ্যে মঙ্গল। অনুষ্ঠানের যে সকল আয়োজন, যে সকল চিহ্ন শুভ রচনা করে, আমাদের দেশে তার ভার মেয়েদের উপর। নারীশক্তিতে আমরা মধুরের সঙ্গে মঙ্গলের মিলন অনুভব করি।[৪৭]

নারীর কল্যাণবোধ বা প্রার্থনা গন্ধধূপের মতো উদ্ভাসিত হয় বা চিহ্ন ধারণ করে। মায়ের আশীর্বাদে, সিঁদুরের ফোঁটায়, কঙ্কণে, উলুধ্বনি-শঙ্খধ্বনিতে সেই কল্যাণের উচ্চারণ ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়। নারীর প্রেম তাই কেবল আনন্দ নয় কল্যাণের ধর্মে বিশিষ্ট। এই প্রেম এমন এক শক্তি যার কেন্দ্রীয় আকর্ষণ পৃথিবীর সর্বত্র অনুভব করা যায়। এই প্রেমের শক্তিতেই মেয়েরা বিশ্বকে নাড়িয়ে দেয়। নারীকে রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেন বিশ্বের পালয়িত্রী-প্রতিভারূপে : 'বিষ্ণুর প্রকৃতিতে যে প্রেমের শক্তি বিশ্বকে পালন করছে সেই শক্তিই তো লক্ষ্মী, বিষ্ণুর প্রেয়সী। লক্ষ্মী সম্বন্ধে আমাদের মনে যে ভাবকল্পনা আছে তাকে

আমরা প্রত্যক্ষ দেখি নারীর আদর্শে।' রবীন্দ্রনাথ নারীপ্রকৃতিতে অনুভব করেন স্থিতি। সে সার্থকতার জন্য বাইরের দিকে ছোটে না, সন্ধান করে অন্তরে, ফিরে আসে নিজের কাছে। সে দ্বিধাহীন, জীবধাত্রী, জীবপালিনী; তার মধ্যে কোনো চঞ্চলতা নেই। কিন্তু পুরুষ চঞ্চল, গতিমত্ত। পুরুষের সভ্যতাকে চরম পরিণতি দেবার জন্য তাই নারীর স্থিতিবোধের প্রয়োজন। ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯২৪-এ লিখিত এক পত্রে *রক্তকরবীর* ভাবসম্পদ ব্যাখ্যা ও নারী-পুরুষের শক্তিমত্তার ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করছেন রবীন্দ্রনাথ :

> নারীর ভিতর দিয়ে বিচিত্র রসময় প্রাণের প্রবর্তনা যদি পুরুষের উদ্যমের মধ্যে সঞ্চারিত হবার বাধা পায় তা হলেই তার সৃষ্টিতে যন্ত্রের প্রাধান্য ঘটে। তখন মানুষ আপনার সৃষ্ট যন্ত্রের আঘাতে কেবলই পীড়া দেয়, পীড়িত হয়।
> এই ভাবটা আমার রক্তকরবী নাটকে প্রকাশ পেয়েছে। যক্ষপুরে পুরুষের প্রবল শক্তি মাটির তলা থেকে সোনার সম্পদ ছিন্ন করে আনছে। নিষ্ঠুর সংগ্রহের লুব্ধ চেষ্টার তাড়নায় প্রাণের মাধুর্য সেখান থেকে নির্বাসিত।...
> এমন সময় সেখানে নারী এল, নন্দিনী এল; প্রাণের বেগ এসে পড়ল যন্ত্রের উপর; প্রেমের আবেগ আঘাত করতে লাগল লুব্ধ দুশ্চেষ্টার বন্ধনজালকে। তখন সেই নারীশক্তির নিগূঢ় প্রবর্তনায় কী করে পুরুষ নিজের রচিত কারাগারকে ভেঙে ফেলে প্রাণের প্রবাহকে বাধামুক্ত করবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হল, এই নাটকে তাই বর্ণিত হয়েছে।[৪৮]

প্রকৃতিতে পুরুষেরা অস্থির, কিন্তু নারীরা তার স্থান নির্দিষ্টভাবেই পেয়েছে। সে সম্বন্ধের সত্যকেও পেয়েছে, সেখানেই তার মুক্তি। এই সম্বন্ধ ভালোবাসার, নারীর মুক্তিও তাই ভালোবাসায়। এর মাধ্যমেই নারী তার কর্মকে সৃষ্টির দিকে নিয়ে যেতে পারবে। হারুনা-মারু জাহাজ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯২৪-এ রবীন্দ্রনাথ আরো জানাচ্ছেন : 'যে মেয়ের মধ্যে সত্য আছে সে আপন বন্ধনকে স্বীকার করেই প্রেমের দ্বারা তাকে অতিক্রম করে; বন্ধনকে ত্যাগ করার চেয়ে এই মুক্তি বড়ো।'[৪৯] পুরুষ পালিয়ে মুক্তি চায়, সে সংসার থেকেও পালাতে চায়; কিন্তু নারী মাতৃত্বের মাধ্যমে মুক্তি পায় — এমনই অভিমত রবীন্দ্রনাথের; 'মেয়েরা যখনই মাতৃত্বের অধিকার পেয়েছে তখনই এমন-সকল হৃদয়বৃত্তি পেয়েছে যাতে করে সংসারের সঙ্গে সম্বন্ধস্থাপন তাদের পক্ষে সহজ হতে পারে।' প্রেমই নারীর কেন্দ্রগত জ্যোতির উৎস। এই প্রেমের সম্বন্ধও সংসারে, সেখানে সে লক্ষ্মী। নারী তাই আলোতে স্থিত, নারী শেষপর্যন্ত সাধনায় প্রাপ্য সাধনারই ধন; ২ অক্টোবর ১৯২৪-এর একটি পত্রে জানান :

> পুরুষের সংসারে সত্যকার মেয়ে তো কেবলমাত্র চোখের দেখার নয়, সে তো ধ্যানের জিনিসও বটে। সে যে শরীরী অশরীরী দুয়ে মিলিয়ে, পৃথিবী যেমন নিজের মাটি ধুলো এবং নিজের চারদিকের অসীম আকাশ ও বায়ুমণ্ডল মিলিয়ে। মেয়ের যা অশরীরী তা যে শরীরী মেয়েকে ঘিরে আছে; তার ওজন নেই, কিন্তু তার বর্ণ আছে, ভঙ্গী আছে; তা ঢাকে অথচ তা প্রকাশ করে।[৫০]

এই পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ নারী-প্রসঙ্গে কল্পনা ও আদর্শবাদের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। এই বোধে নারী শেষ পর্যন্ত পুরুষেরই কল্পনাজাত অপূর্ব সত্তা যা পুরুষেরই আবেগঘটিত প্রয়োজন মেটায়। তবে শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ নারীবাস্তবতার আন্তরিকতার দর্শনটিও উপস্থাপন করেছেন; প্রসঙ্গত নারীবাদেও এর স্থান আছে : 'একদল মেয়ে বলতে শুরু

করেছে যে, "মেয়ে হওয়াতে আমাদের অগৌরব, আমাদের ক্ষতি। অর্থাৎ, আমাদের আত্মপ্রকাশের ধারায় পুরুষের সঙ্গে প্রভেদটাতে পীড়া পাচ্ছি।" এর থেকে বোধ হচ্ছে, একদিন যে পুরুষ সাধক ছিল এখন সে হয়েছে বণিক। বণিক বাইরের দিকে যদিবা চলে, অন্তরের দিকে আপনার সঞ্চয়ের বোঝার কাছে সতর্ক হয়ে পড়ে আছে।'[৫১]

রবীন্দ্রনাথ নরসমাজে নারীশক্তিকে 'আদ্যাশক্তি' হিসেবে বিবেচনা করেছেন। সৃষ্টির আদি সংবেদনা নারী প্রকৃতিগতভাবেই ধারণ করে তার রক্তে, তার হৃদয়ে। প্রকৃতিই 'জীবপালনের সমস্ত প্রবৃত্তিজাল প্রবল করে জড়িত করেছেন নারীর দেহমনের তন্তুতে তন্তুতে।' এই প্রবৃত্তিই সমাজে নারীর প্রেম, স্নেহ ও সকরুণ ধৈর্য এবং এই বৈশিষ্ট্যগুলোই সমাজগঠনের মূল। এখানে নারীর কৃতিত্বের কথা বলছেন রবীন্দ্রনাথ : 'সংসারের এই গোড়াকার বাঁধন না থাকলে মানুষ ছড়িয়ে পড়ত আকারপ্রকারহীন বাষ্পের মতো; সংহত হয়ে কোথাও মিলনকেন্দ্র স্থাপন করতে পারত না। সমাজবন্ধনের এই প্রথম কাজটি মেয়েদের।'[৫২] পুরুষ কেবল সৃষ্টির গতি মানে, তার মধ্যে বিনাশেরও প্রবল টান। কিন্তু নারী প্রেয়সী ও জননী-প্রকৃতির শক্তিতে পুরুষের বিনাশপ্রবণ সৃষ্টির অন্তরালে আপন কর্ম করছে। ফলে নারী নিয়ে আসছে কীর্তির স্থিরপ্রতিষ্ঠা। নতুনত্বের ভাঙাগড়ায় পুরুষ সর্বদাই থাকে আগন্তুকরূপে, কিন্তু নারী হৃদয়সম্পদের শক্তিতে সর্বদাই থাকে মূলধারায়, তাই 'নারী পুরাতনী।' কিন্তু পুরুষই ডেকে এনেছে সংকট, সে নারীকে কেবল ব্যক্তিগত গণ্ডির ভেতরে আটকে রাখায় ও ব্যবহারে সংকীর্ণ করে ফেলেছে। রবীন্দ্রনাথ একে বলেছেন নারীর প্রতি 'আবিলবুদ্ধি মূঢ়মতি পুরুষ'-এর অত্যাচার। কিন্তু নারীর স্বাধীনতাকে স্বীকার করতেই হবে, তার সীমা আজ বিশ্বসংসারে বিস্তৃত হচ্ছে : 'মেয়েদের জীবন আজ সকল দিক থেকেই স্বতই তার তটের সীমা দূরে চলে যাচ্ছে। নদী উঠছে মহানদী হয়ে।' রবীন্দ্রনাথ নারীকে বাইরের পৃথিবীতে পদাপর্ণের উপযোগী যেমন দেখতে পাচ্ছেন, তেমনি সুযোগের, অধিকারের, শক্তিমত্তার ব্যাপারগুলোও তুলে ধরেছেন। কেবল গৃহিণীপনা নয়, শিক্ষাও নারীর প্রয়োজন, সমাজের সাপেক্ষেই তা অনিবার্য। শিক্ষা নারীর অস্তিত্বকেও সুদৃঢ় করে, ভিত্তি দেয়। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ হয়ত তার সুবিধার জন্যই বিপরীত কিছু চাইতে পারে : 'তারা জানে, অজ্ঞানের অন্ধ সংস্কারের আবহাওয়ায় যথেচ্ছ শাসনের সুযোগ রচনা করে; মনুষ্যোচিত স্বাধিকার বিসর্জন দিয়েও সন্তুষ্টচিত্তে থাকবার পক্ষেই এই মুগ্ধ অবস্থাই অনুকূল অবস্থা। আমাদের দেশের অনেক পুরুষের মনে আজও এই ভাব আছে। কিন্তু কালের সঙ্গে সংগ্রামে তাদের হার মানতেই হবে।' অর্থাৎ নারীর বিজয় হবে। নারীর স্বাধীনতা আসবে, এই কালের অমোঘ গতি ও নির্দেশ; যারা প্রতিবন্ধকতা তৈরি করবে তারা পরিত্যক্ত হবে। কেবল গার্হস্থ্য-দরে নারীকে আর বিবেচনা করা যাবে না বলেই মনে করেন রবীন্দ্রনাথ; তাদের একটি 'সার্বভৌমিক' মূল্য তৈরি হবেই। নারী বিশ্বের উন্মুক্ত প্রান্তরে আসবে, সেই অনুপাতে তাদের দায়িত্বও গ্রহণ করতে হবে। রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছে 'পৃথিবীতে নূতন যুগ এসেছে।' পুরুষকেন্দ্রিক সভ্যতার সঙ্গে মেয়েদের ভাবনার যোগ ঘটাতে হবে; রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'আজ ভাণ্ডারের দ্বার খুলেছে।'

রবীন্দ্রনাথ নারীকে নতুন যুগে নতুন সভ্যতা সৃষ্টিতে আহ্বান জানাচ্ছেন : 'সভ্যতার নূতন কল্প আশা করা যাক। এ আশা যদি রূপ ধারণ করে তবে এবারকার এই সৃষ্টিতে

মেয়েদের কাজ পূর্ণ পরিমাণে নিযুক্ত হবে সন্দেহ নেই। নবযুগের এই আহ্বান আমাদের মেয়েদের মনে যদি পৌঁছে থাকে তবে তাঁদের রক্ষণশীল মন যেন বহু যুগের অস্বাস্থ্যকর আবর্জনাকে একান্ত আসক্তির সঙ্গে বুকে চেপে না ধরে। তাঁরা যেন মুক্ত করেন হৃদয়কে, উজ্জ্বল করেন বুদ্ধিকে, নিষ্ঠা প্রয়োগ করেন জ্ঞানের তপস্যায়। মনে রাখেন, নির্বিচার অন্ধ রক্ষণশীলতা সৃষ্টিশীলতার বিরোধী। সামনে আসছে নূতন সৃষ্টির যুগ। সেই যুগের অধিকার লাভ করতে হলে মোহমুক্ত মনকে সর্বতোভাবে শ্রদ্ধার যোগ্য করতে হবে, অজ্ঞানের জড়তা এবং সকল প্রকার কাল্পনিক ও বাস্তবিক ভয়ের নিম্নগামী আকর্ষণ থেকে টেনে আপনাকে উপরের দিকে তুলতে হবে। ফলাফলের কথা পরে আসবে — এমন-কি না আসতেও পারে — কিন্তু যোগ্যতা-লাভের কথা সর্বাগ্রে।'[৫৩]

তথ্যনির্দেশ

১ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'জীবনস্মৃতি' (১৩১৯/জুলাই ১৯১২), *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, নবম খণ্ড (আলোচনায় বিশ্বভারতী প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের ১২৫তম জন্মজয়ন্তীতে প্রকাশিত *রবীন্দ্র-রচনাবলীর* সুলভ সংস্করণ ব্যবহার করা হয়েছে; পুনর্মুদ্রণ : আশ্বিন ১৪১৫), পৃ. ৪৪৭

২ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র', উদ্ধৃত : সৈয়দ আকরম হোসেন, *রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস : চেতনালোক ও শিল্পরূপ*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৯৪, পৃ. ৪০

৩ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মন্তব্য। উদ্ধৃত : দীপ্তি চক্রবর্তী, *নারীপ্রগতির স্বরূপ ও রবীন্দ্রনাথ*, জয়দুর্গা লাইব্রেরী, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ৪৯

৪ "আমি স্বভাবতই 'লেডি' জাতিকে বড়ো ডরাই। তাঁদের কাছে ঘেঁষতে গেলে এত প্রকার বিপদের সম্ভাবনা যে, চাণক্য পণ্ডিত থাকলে লেডিদের কাছ থেকে দশ সহস্র হস্ত দূরে থাকতে পরামর্শ দিতেন। এক তো মনোরাজ্যে নানাপ্রকার শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটবার সম্ভাবনা — তা ছাড়া সর্বদাই ভয় হয় পাছে কী কথা বলতে কী কথা বলে ফেলি, আর আমাদের অসহিষ্ণু লেডি তাঁদের আদবকায়দার তিলমাত্র ব্যতিক্রম সইতে না পেরে দারুণ ঘৃণায় ও লজ্জায় একেবারে অভিভূত হন। পাছে তাঁদের গাউনের অরণ্যের মধ্যে ভ্যাবাচেকা খেয়ে যাই, পাছে আহারের সময় তাঁদের মাংস কেটে দিতে হয়, পাছে মুরগির মাংস কাটতে গিয়ে নিজের আঙুল কেটে বসি — এই রকম সাতপাঁচ ভেবে আমি জাহাজের লেডিদের কাছ থেকে অতি দূরে থাকতেম। আমাদের জাহাজে লেডির অভাব ছিল না, কিন্তু জেন্টলম্যানরা সর্বদা খুঁতখুঁত করতেন যে, তার মধ্যে অল্পবয়স্কা বা সুশ্রী একজনও ছিল না।' ['য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র', *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, পৃ ৭৯৮-৭৯৯]

৫ 'আমরা ইতস্তত বেড়াচ্ছি, এমন সময় দেখি একটি সুন্দরী মেয়ে কতকগুলি ফল আর ফুলের তোড়া নিয়ে আমাদের সম্মুখে হাজির হল, তখন আর অগ্রাহ্য করবার সাধ্য রইল না।' ['য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র', পূর্বোক্ত, পৃ. ৮০২]

৬ 'ইতালির মেয়েদের বড়ো সুন্দর দেখতে। অনেকটা আমাদের দেশের মেয়ের ভাব আছে। সুন্দর রঙ, কালো কালো চুল, কালো ভুরু, কালো চোখ, আর মুখের গড়ন চমৎকার।' ['য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র', পূর্বোক্ত, পৃ. ৮০২]

৭ 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র', পূর্বোক্ত, পৃ ৮০৩-৮০৪]

৮ 'এখানকার ধনী ফ্যাশনেবল মেয়েদের কথা একটু বলে নিই। তাঁদের দুরস্ত করতে হলে দিন-দুই আমাদের দিশি শাশুড়ির ও বিধবা ননদের হাতে রাখতে হয়। তাঁরা হচ্ছেন বড়ো মানুষের মেয়ে কিংবা বড়োমানুষের স্ত্রী। তাঁদের চাকর আছে কাজকর্ম করতে হয় না, ...। কেবল একটা বাকি আছে, সেটা হচ্ছে সাজসজ্জা; ... সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত দিনটা তাঁর হাতে আস্ত পড়ে থাকে। সকাল বেলায় বিছানায় পড়ে দরজা-জানলা বন্ধ করে সূর্যের আলো আসতে না দিয়ে দিনটাকে

কতকটা সংক্ষেপ করেন, বিছানায় শুয়ে শুয়ে ব্রেকফাস্ট খান ও এগারোটার আগে শয়নগৃহ থেকে বেরোলে যথেষ্ট ভোরে উঠেছেন মনে করেন।' ['য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র', পূর্বোক্ত, পৃ. ৮২০]

৯ 'তা ছাড়া আছে ভালোবাসার অভিনয়। মিষ্টি হাসি ও মিষ্টি কথার আদান-প্রদান, অলীক ছুতো নিয়ে একটু অলীক অভিমান, হয়তো পুরুষ-পক্ষ থেকে একটু রসিকতা, অপর পক্ষে উদ্যত ক্ষুদ্র মুষ্ঠি সহযোগে সুমধুর লাঞ্ছনা, "Oh you naughty, wicked, provoking man!" তাতে নটি ম্যান-এর পরিপূর্ণ তৃপ্তি। এইরকম ভিজিটর অভ্যর্থনা, ভিজিট প্রত্যর্পণ, নতুন নভেল পড়া, নতুন ফ্যাশন সৃষ্টি ও নতুন ফ্যাশনের অনুবর্তন করা, এবং তার সঙ্গে মধুর রস যোগ করে ফ্লার্ট এবং হয়তো 'লাভ' করা তাঁদের দিনকৃত্য। আমাদের দেশে যেমন ছেলেবেলা থেকে মেয়েদের বিয়ের জন্যে প্রস্তুত করে, যথেষ্ট লেখাপড়া শেখায় না, কেননা মেয়েদের আপিসে যেতে হবে না, এখানেও তেমনি মাগ্‌গি দরে বিকোবার জন্যে মেয়েদের ছেলেবেলা থেকে পালিশ করতে থাকে, বিয়ের জন্যে যতটুকু লেখাপড়া শেখা দরকার ততটুকুই যথেষ্ট।' ['য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র', পূর্বোক্ত, পৃ. ৮২০-২১]

১০ 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র', পূর্বোক্ত, পৃ. ৮২১-৮২২

১১ 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি', *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৮৪৫

১২ পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৪৬

১৩ পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৪৯

১৪ "পারিবারিক দাসত্ব" (চৈত্র ১২৮৭), *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, সপ্তদশ খণ্ড, পৃ. ৩৭৩

১৫ "স্ত্রৈণ" (ভাদ্র ১২৮৮?), 'বিবিধ প্রসঙ্গ' (১১ সেপ্টম্বর ১৮৮৩), *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, চতুর্দশ খণ্ড, পৃ. ৬৯৪

১৬ "সমস্যা", 'সমালোচনা', *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, পঞ্চদশ খণ্ড, পৃ. ১১২

১৭ পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৩

১৮ 'চিঠিপত্র', *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৮৬৭

১৯ "হিন্দুবিবাহ" (১২৯৪), পরিশিষ্ট/'সমাজ', *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৬৭০-৬৭১

২০ পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৭২

২১ "সমাজে স্ত্রী-পুরুষের প্রেমের প্রভাব", *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, সপ্তদশ খণ্ড, পৃ. ৪৬৩

২২ "রমাবাইয়ের বক্তৃতা-উপলক্ষে : পত্র" (জ্যৈষ্ঠ ১২৯৬), পরিশিষ্ট/'সমাজ', *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৬৭৯

২৩ পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৮০

২৪ "প্রাচ্য ও প্রতীচ্য" (১২৯৮), 'সমাজ', *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৫৪১

২৫ "সমুদ্রযাত্রা" (১২৯৯), 'সমাজ', *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৫২৫

২৬ "নরনারী" (চৈত্র ১২৯৯), 'পঞ্চভূত', *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৮৯৮

২৭ পূর্বোক্ত, পৃ. ৯০০

২৮ পূর্বোক্ত, পৃ. ৯০১

২৯ "অখণ্ডতা" (শ্রাবণ ১৩০০), 'পঞ্চভূত', *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৯১৬

৩০ পূর্বোক্ত, পৃ. ৯১৭-৯১৮

৩১ "বিহারীলাল" (আষাঢ় ১৩০১), 'আধুনিক সাহিত্য', *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ৫৪১-৫৪২

৩২ "রাজসিংহ" (মাঘ-ফাল্গুন ১৩০১), 'আধুনিক সাহিত্য', *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ৫৭২

৩৩ "সমাজভেদ" (১৩০৮), 'স্বদেশ', *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৫১০

৩৪ "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" (শ্রাবণ ১৩০৯), 'সাহিত্য', *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৬৮০

৩৫ "রঙ্গমঞ্চ" (পৌষ ১৩০৯), 'বিচিত্র প্রবন্ধ', *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৬৭৯

৩৬ "সাহিত্যের তাৎপর্য" (অগ্রহায়ণ ১৩১০), 'সাহিত্য', *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৬২০

৩৭ "ব্রতধারণ" (ভাদ্র ১৩১২), 'আত্মশক্তি', *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৬৮৭

৩৮ “সৌন্দর্যবোধ” (পৌষ ১৩১৩), ‘সাহিত্য’, *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৬৩৫
৩৯ “সাহিত্যসৃষ্টি” (আষাঢ় ১৩১৪), ‘সাহিত্য’, *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৬৫৭
৪০ “প্রার্থনা” (২ পৌষ ১৩১৫), ‘শান্তিনিকেতন’, *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, সপ্তম খণ্ড, পৃ. ৫৪০
৪১ “বিকার-শঙ্কা” (৩ পৌষ ১৩১৫), ‘শান্তিনিকেতন’, *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, সপ্তম খণ্ড, পৃ. ৫৪০
৪২ “কর্ম” (২৭ পৌষ ১৩১৫),‘ শান্তিনিকেতন’, *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, সপ্তম খণ্ড, পৃ. ৫৮২
৪৩ “শুচি” (আশ্বিন ১৩১৯), ‘শান্তিনিকেতন’, *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, অষ্টম খণ্ড, পৃ. ৬৩০
৪৪ “স্ত্রীশিক্ষা” (ভাদ্র-আশ্বিন ১৩২২), ‘শিক্ষা’ (সংযোজন), *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, ষোড়শ খণ্ড, পৃ. ২৮৬-২৮৭
৪৫ “জাপান-যাত্রী’ (শ্রাবণ ১৩২৬/১৯১৯), *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, দশম খণ্ড, পৃ. ৪০৩
৪৬ পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০৪
৪৭ “পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি”, ‘যাত্রী’ (জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৬), *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, দশম খণ্ড, পৃ. ৪৫০
৪৮ পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫১
৪৯ পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫৩
৫০ পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫৮
৫১ পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫৮
৫২ “নারী” (অগ্রহায়ণ ১৩৪৩), ‘কালান্তর’, *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, পৃ. ৬২১
৫৩ পূর্বোক্ত, পৃ. ৬২৫